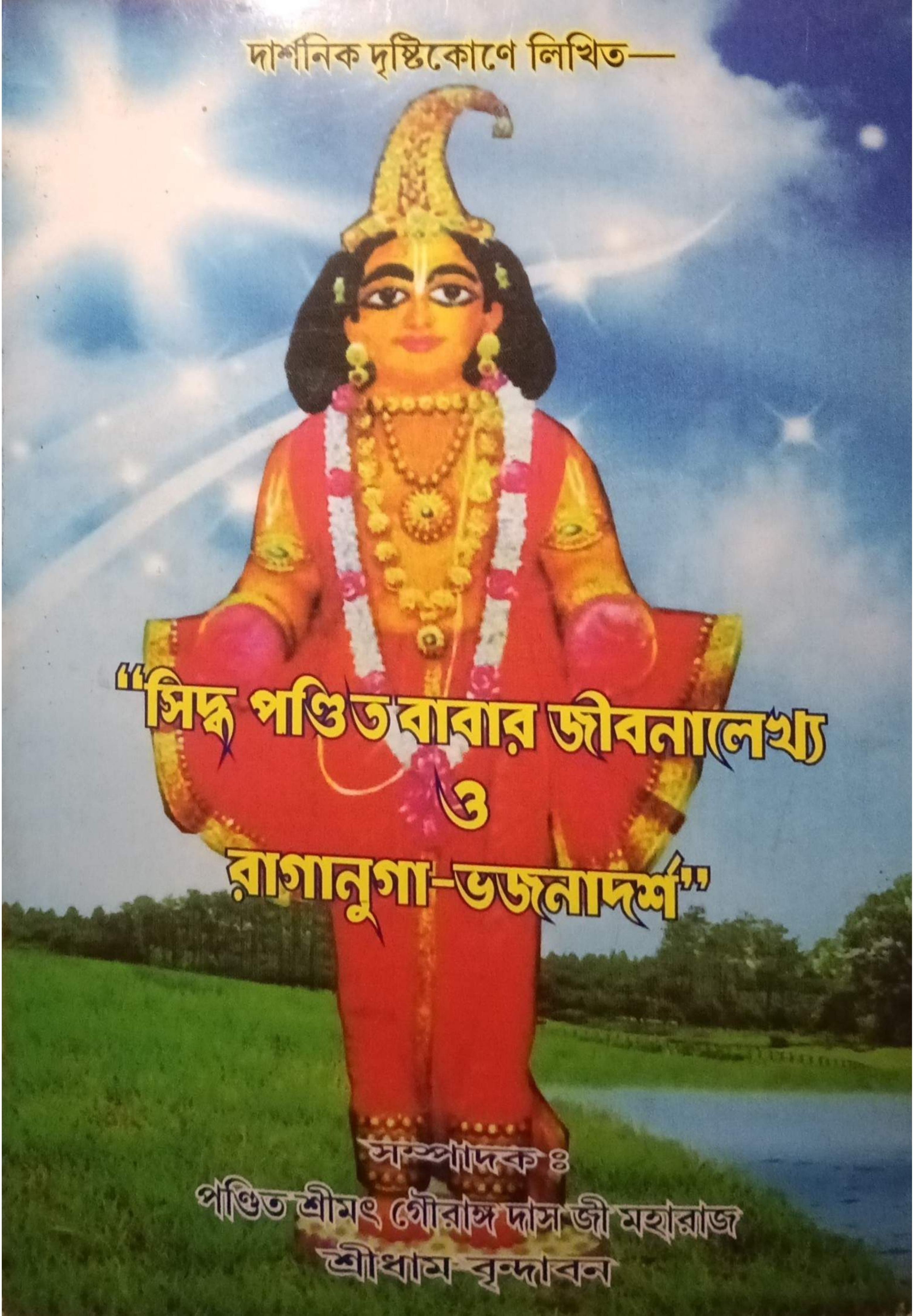
দার্শনিক দৃষ্টিকোণে লিখিত—



"সিদ্ধ পণ্ডিত বাবার জীবনালেখ্য ও রাগানুগা-ভজনাদর্শ"

সম্পাদক ঃ
পণ্ডিত শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ দাস জী মহারাজ
শ্রীধাম বৃন্দাবন

"সিদ্ধ পণ্ডিত বাবার জীবনালেখ্য
ও
রাগানুগা-ভজনাদর্শ"

দার্শনিক দৃষ্টিকোনে লিখিত—

"সিদ্ধ পন্ডিত বাবার জীবনালেখ্য
ও
রাগানুগা–ভজনাদর্শ"

সম্পাদক ঃ

পন্ডিত শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ দাস জী মহারাজ

শ্রীধাম বৃন্দাবন

প্রকাশক ঃ ঠাকুর শ্রীগিরীন্দ্র বিহারী ট্রাষ্ট

ভাগবত নিবাস, রমনরেতি—বৃন্দাবন

সভাপতি ঃ শ্রীরামগোপাল দাস জী মহারাজ

সম্পাদক ঃ শ্রীশুকদেব দাসজী মহারাজ

১ম সংকলন ঃ ১০০০

প্রকাশন তিথি ঃ শ্রীগুরু পূর্ণিমা ১৪২২ বঙ্গাব্দ

শ্রীচৈতন্যাব্দ ঃ ৫৩০

প্রচার অনুকুল্যে ঃ ৫০ টাকা

মুদ্রাকর ঃ রকমারী অফসেট প্রিন্টার্স
(রাম চন্দ্র দাস)
আমতলা, পোঃ-বিষ্ণুপুর
জেলা-দঃ ২৪ পরগণা (পঃ বঃ),
পিন-৭৪৩৫০৩

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীভাগবত নিবাস রমনরেতি
শ্রীশুকদেব দাসজী মহারাজ
মোবাইল ঃ ৯৯৯৭৮১১০৪০

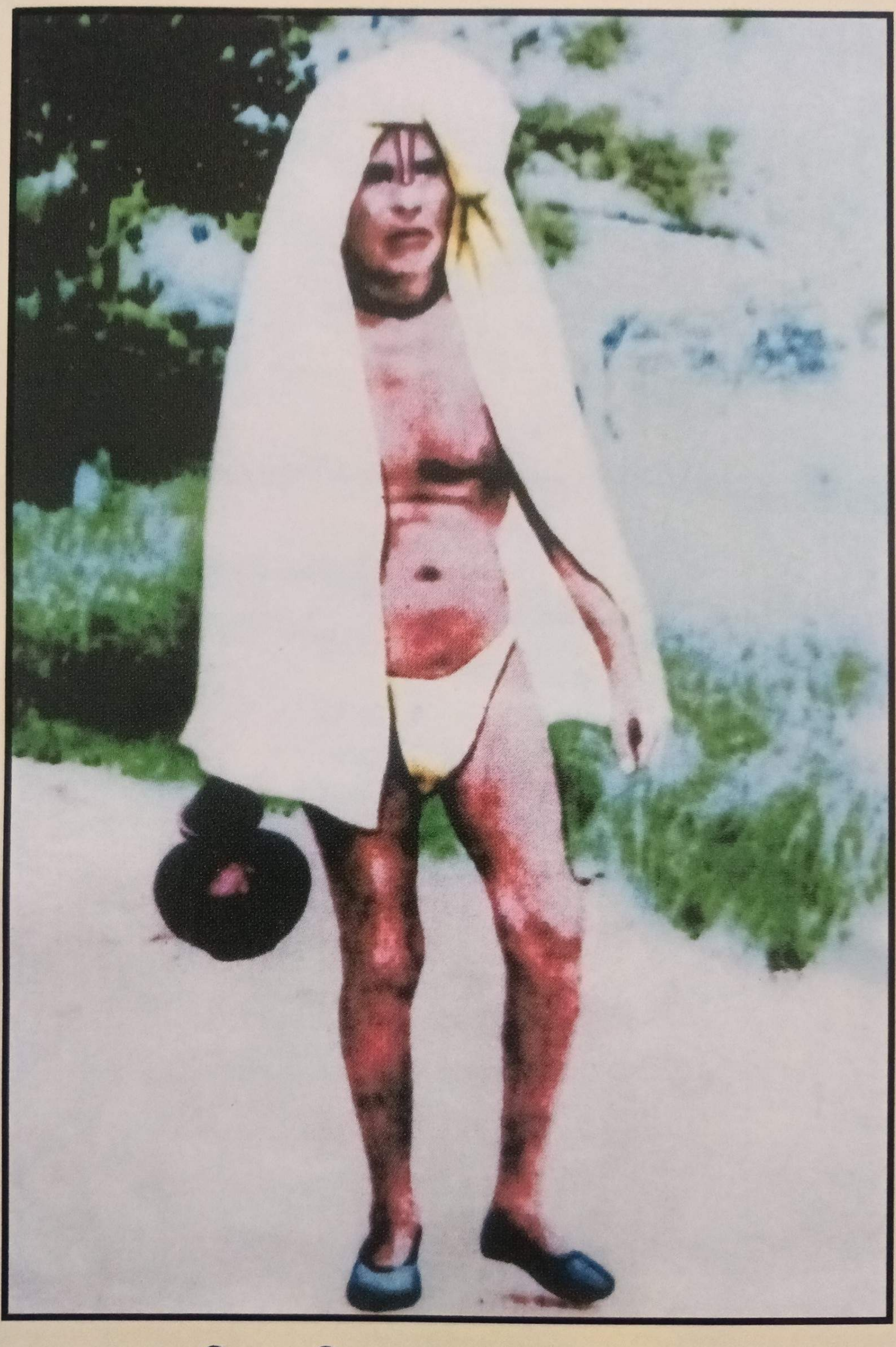
২। পন্ডিত শ্রী গৌরাঙ্গ দাসজী মহারাজ
শ্রীগোপালস জীউ মন্দির, দন্ডপানিতলা ঘাটরোড
মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৬১২৭০৩

৩। শ্রীবিনোদ কৃষ্ণ দাস (বিজয়)
শ্রীপাট বাড়ী আশ্রম, বরাহনগর, কোলকাতা – ৩৫
মোবাইল ঃ ৯৮৭৪৩৬৪৩৭৬

৪। পন্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ দাসজী মহারাজ
শ্রীমদ্ রজনী বাবার আশ্রম, গোবিন্দ কুন্ড, বৃন্দাবন
মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৬১২৭০৩ / ৮৭৫৫৪৯৬৩০৩

৫। শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ন ঘোষ
নেতাজীনগর, কোলকাতা–৭২
মোবাইল ঃ

৬। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা–৬
ফোন ঃ ০৩৩–২২৮১ ১২০৮



সিদ্ধ পণ্ডিত বাবা পরম পূজ্যপাদ
শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ
ভাগবত নিবাস, বৃন্দাবন

।। নম্র নিবেদন।।

শ্রীগুরবে নমঃ

"কুলাধিদেবতা মোর মদন মোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ-সনাতন।।"
"যাঁর প্রানধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য।
সে বৈষ্ণবের পদরেনু তাঁর পদছায়া।
মো-হেন অধমে দিল নিত্যানন্দ দয়া।"

শ্রীমৎ কবিরাজের শ্রীপাদ পদ্মরেণুর আনুগত্যে জানাই আমাদের পরমারাধ্যতম পরম দেবতা শ্রীশ্রী রাধা-মদনমোহন জীউ এবং শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় তথা পরমারাধ্য শ্রীগুরু-পদপদ্মের অনুকম্পায় "সিদ্ধ পন্ডিত বাবার জীবনালেখ্য ও রাগানুগা-ভজনাদর্শ" নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি প্রকাশিত হোল।

এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার বলার বিষয়ে এই যে, প্রভুর প্রেরণায় কিছুদিন থেকে মনের মধ্যে এই চিন্তা উদিত হচ্ছিল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর যা অভীষ্ট এবং যা শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীপাদ কর্ত্তৃক সুনির্নীত সেই 'রাগানুগা-ভজনাদর্শের' যথার্থ তত্ত্বটি যথাযথ ভাবে নিরূপন করা।

কিন্তু সাধন-ভজন হীন, বিদ্যা-বুদ্ধিহীন মাদৃশ অধম পামর জীবের পক্ষে এ-এক আকাশ-কুসুম কল্পনা। তথাপি প্রভুর কৃপার উপর ভরসা করে ঐ চিন্তা থেকে নিবত্ত হইনি।

এমনই সময়ে শ্রীবৃন্দাবন-রমনরেতি স্থিত পরম পূজ্যপাদ সিদ্ধ পন্ডিত বাবার (পন্ডিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দাস সিদ্ধ বাবার) অন্তরঙ্গ সেবক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃপাসিন্ধু দাস বাবা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আড়ম্বর-হীন বিরাট আশ্রাম শ্রীভাগবত নিবাস এর বর্ত্তমান সম্পাদক ও পরিচালক পরম প্রীত্যাস্পদ শ্রীশুকদেব দাসজী মহারাজ, 'সিদ্ধ পন্ডিত বাবার জীবনী' লেখার জন্য আমার কাছে বারম্বার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে প্রভুর ইচ্ছা মনে করে নিজের যোগ্যতা না থাকলেও এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি।

এদিকে রাগানুগা-ভজনাদর্শের বিচারও মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। 'সিদ্ধ পন্ডিত বাবা' ছিলেন রাগানুগা-ভজনাদর্শের এক জীবন্ত মূর্ত্তি। এই কারণে এই রচনার মধ্যে প্রাসঙ্গিক ভাবে 'রাগানুগা ভক্তি' সম্পর্কে দিগদর্শন-ন্যায়ে কিছু অলোচনা করা হয়েছে। ঐ ভজনের যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করতে হলে পৃথক ভাবে বিশদ আলোচনা ব্যতীত সম্ভব নয়। তবে যে পটভূমিতে আরোহন না করলে ঐ রাগানুগা ভক্তির ভজনটি কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না, সেই বিষয়-বিতৃষ্ণা পূর্ব্বক বৈরাগ্যের কথাই এখানে স্থান বিশেষে জানানো হয়েছে। কারণ রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তির নামই রাগানুগা ভক্তি।

যথা-'রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে'

(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু-১/২/২৭০)

অর্থাৎ একমাত্র ব্রজবাসীগণের হৃদয়ে বিরাজিত যে রাগাত্মিকা ভক্তি, তার অনুগতা ভক্তিকেই রাগানুগা ভক্তি বলে।

রাগানুগা ভক্তির যাঁকে মূল সংস্থাপক আচার্য্য বলা হয় সেই শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের লিখিত উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারেই কবিরাজ গোস্বামীপাদ রাগাত্মিকা গোপীগণের যে চরিত্র লিখিছেন, তার দিকে মনোনিবেশ করলেই বোঝা যায় যে, গোপীগণের প্রকৃত আনুগত্য করতে হলে কি ভাবে সর্ব্ব প্রকার বিষয় ভোগের সংস্পর্শকে প্রথমেই সম্পূর্ণরূপে আবর্জ্জনার মত মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার অনিবার্য্য প্রয়োজন হয়।

যথা- "সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন।।
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-১)

মাত্র কয়টি কথার মধ্যেই জানা যায় যে, ব্রজ দেবীগনের জীবন সর্ব্ব ত্যাগের চরম শিখরে প্রতিষ্ঠিত। বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুরাগে তাঁদের মন, বুদ্ধি, ভাবনা, হৃদয় এবং সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

ভাগবতে বলা আছে-"ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ"। ক্ষণকাল মাত্র সময় কৃষ্ণকে দর্শন না করলে শত-শত যুগের কৃষ্ণ অদর্শনের প্রতীতি হয়। এই হল গোপীগণের চরিত্র কেবলমাত্র কৃষ্ণ সুখের জন্য সর্বত্যাগ, কৃষ্ণই জীবনের মূলধন। সেই গোপীগণের ভাব অঙ্গীকার করার পরই ঐ ভজনটি শুরু করতে হয়। ভক্তির নাম রাগানুগা, রাগাত্মিকার অনুগতা, তাই রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। উক্ত রাগাত্মিকা ভক্তিটি শাস্ত্র-লোকের অতীত একমাত্র গোপ-গোপীগণের হৃদয়ে বিরাজিত। তার মধ্যে

গোপীগণের প্রেমই চরম ভূমিতে উন্নীত।

"অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।।
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করি তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-রায় রামানন্দ সংবাদ)

এই হোল রাগানুগা-ভক্তি অনুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-শৈলী ও ভজন-পরিপাটী।

আমরা অনেকেই জানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভিষিক্ত ও নির্ণীত এই ভজন শিক্ষার প্রধান আচার্য্য হলেন শ্রীরূপ পাদ ও শ্রীসনাতন পাদ। তাঁরাই এই সাধন-মার্গের দর্শনিক-প্রতিষ্ঠাতা। শাস্ত্রীয় প্রমান ও সিদ্ধান্ত অনুসারে মার্গ স্থাপন করেছেন। শ্রীরূপ পাদের শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু ও শ্রীসনাতন পাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থই হল বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হার্দ্য ব্রজ গোপীগণের অনুরাগাত্মিকা প্রেমভক্তির তত্ত্ব ও তার প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতম সাধনের তাত্ত্বিক প্রতিপাদনের গ্রন্থ। এই কারণে কবিরাজ পাদ লিখেছেন--

"সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণ তত্ত্ব, জানি যাহা হৈতে।।
সনাতন হৈতে পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ হৈতে পাইনু ভক্তি রস প্রান্ত।। (চৈঃ চঃ)

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, ভক্তি রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমনি গ্রন্থকে লক্ষ্য করেই কবিরাজ পাদ উক্তিটি লিখেছেন।

ঐ গ্রন্থগুলির মর্মানুসারে সাধন ব্যতীত ব্রজপ্রেমের তত্ত্ব, গোপীভাবের তত্ত্ব, কেবল আলোচনাতেই থেকে যাবে, জীবনে

অনুভব হবে না। কারণ, রাগাত্মিকা গোপীগণের আনুগত্যে সাধন করাই হচ্ছে রাগানুগা ভক্তি। ব্রজ গোপীগনের আনুগত্যের উপরেই ঐ ভজনটি দাঁড়িয়ে আছে। গোপীগণের চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান না হলে আনুগত্য করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। জীবনটাকে গোপীদের মত কেবলমাত্র কৃষ্ণানুরাগের ভাবে ভাবিত করার নামই হ'ল গোপী আনুগত্য। আর আমরা কে কোথায় আছি, কিভাবে আছি, তা সবাই জানি। বিষয়-ভোগ, বিষয়-সম্পদের উপর কত রখম কামনা আমাদের মনের মধ্যে জমাট হয়ে আছে, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আর গোপীগণের সমস্ত চেষ্টাই হচ্ছে কেবলমাত্র কৃষ্ণ সুখের জন্য। শ্রীরূপ পাদ লিখেছেন-

"কৃষ্ণ সৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমম্" (ভঃ রঃ সিঃ)

আবার শ্রীসনাতন পাদ লিখেছেন—

"বযন্ত্ববখিল নিরপেক্ষা এব কেবলং ত্বদেকলাম্বন জীবনা ঃ

"(বৃ-ভাঃ দিগ্‌দর্শিনাটাকা)

অর্থাৎ—মথুরা গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণ বলেছেন, আমাদের অবস্থাটা দেখ! আমরা কিন্তু অখিল নিরপেক্ষ, তুমি ব্যতীত আমাদের কোথাও লেশমাত্রও অপেক্ষা নেই। কেবলমাত্র তুমিই আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন।" এই হোল গোপী ভাব, গোপীগণের জীবনের আদর্শ। এইবার বুঝুন তাহলে ঈদৃশ গোপীগণের আনুগত্যের উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে হবে প্রকৃত রাগানুগা মার্গে শ্রীরীধাকৃষ্ণের ভজন। তাহলে সর্বপ্রকার বিষয়ভোগের কামনা ও সমস্ত রখমের বিষয় ভোগের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা যে কতখানি অনিবার্য্য

ভাবে অপরিহার্য্য প্রয়োজন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং সর্বত্যাগ ব্যতীত যে, ঐ ভজনটি শুরুই হতে পারে না, এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার সত্য। যে মহাপুরুষের জীবনী এখানে লেখা হয়েছে, তাঁর নিরপেক্ষতা একটি মহান্ আদর্শ ছিল। সামান্যতম বস্তুর সঞ্চয়ও তিনি স্বীকার করেননি। একটি পাত্রে কিছু মিছরি খন্ড জমা ছিল, তাই দেখে বৃদ্ধ অবস্থাতেও অন্তরঙ্গ সেবক কৃপাসিন্ধু বাবাকে ও দাউজী বাগিচার নিজ ভজন কুটির পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। কৃপা সিন্ধু বাবা প্রথমে বুঝতেই পারেননি, দৌড়ে গিয়ে বাবার চরণ ধরে অনুনয় করে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। মিছরি খন্ডগুলি বনের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। 'নিরপেক্ষতা' ও 'দীনতাকেই বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রী সনাতন গোস্বামীপাদ রাগানুগামার্গে ব্রজপ্রেম প্রাপ্তির অতি উত্তম সাধন বলেছেন।

সিদ্ধ পন্ডিত বাবা নিরপেক্ষতার চূড়ান্ত আদর্শ দেখিয়েছেন। তিনি বীর পুরুষের মত বিপুল বিক্রমে সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে প্রতিহত করে, অপ্রতিহত সাহস ও অদম্য উৎসাহের সাথে সকল প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করে, কেবলমাত্র ব্রজবাসীগণের গৃহের মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারাই আমরণ কাল বিশুদ্ধ বৈরাগ্যকে অবলম্বন করে ঐকান্তিক অনুরাগের সাথে সারাটা জীবন ভজন করেছেন। আজীবন ব্রসবাস নিষ্ঠা থেকে কখনও বিচলিত হ'ননি। তার পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। অন্তরে লীলার স্ফুরণ অব্যাহত ছিল। যে গোবিন্দ দেব জীউ শিশুকালে গুটিকা খেলার ছলে কৃপা করেছিলেন, সেই

গোবিন্দ দেব জীউই পন্ডিত বাবার অন্তিম সময়ে ভক্ত দ্বারা জয়পুর থেকে প্রসাদ চরনামৃত প্রেরণ করে শেষ সময়েও কৃপা করলেন। পন্ডিত বাবা সেই প্রসাদ-চরণামৃত পেয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দিব্যধামে গমন করেন। একথা শ্রীহরি নারায়ণ শর্মাজী মহোদয় তাঁর রচনায় বর্ননা করেছেন।

মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতই আমাদের বিশুদ্ধ সাধন-পথের আলোক স্তম্ভ। সর্বপ্রকার লোভনীয় বস্তুর প্রলোভনকে সাহসের সাথে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিভাবে পরিত্যাগ করতে হয়, মহাবৈরাগ্যের প্রশস্ত ভুমিতে উপনেবশন করে সুদৃঢ় সংকল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কিভাবে অনন্য ভজনে ব্রতী হতে হয়, নির্ভীক, কাপুরুষতা-শুন্য অজেয় পৌরুষ নিয়ে সাধন-ভজনে কিভাবে জীবনকে সর্মপণ করতে হয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও কৃপালাভের জন্য কিভাবে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে অকপটে নিজের ষোলআনা দিতে হয়, তার অতি উত্তম শিক্ষা আজ আমরা লাভ করতে পারি এই মহাপুরুষের বিশুদ্ধ-বলিষ্ঠ-আদর্শ জীবন-চরিতের মধ্যে। মহাপুরুষগনই হলেন সাধন পথের দিশারী।

আজ যে আমরা বিষয়-পরিত্যাগ রূপী-বৈরাগ্যকে জীবন থেকে বহুদূরে সরিয়ে দিয়ে অর্থাদি বিষয়-ভোগের ভিতরেই প্রেম্র-ভক্তি লাভের স্বপ্ন দেখছি, এই স্বপ্ন দেখার তখনই অবসান হবে, যে দিন আমরা রাগানুগা মার্গের প্রকৃত মহাপুরুষের অকপট বৈরাগ্যের দৃঢ়তাকে, তাঁদের ভজন-নিষ্ঠার সুদৃঢ় সংকল্পকে, তাঁদের অজেয় পৌরষ ও অক্ষয় নির্মল সাধুত্বকে, যথাযথভাবে বুঝতে শিখব। জীবনে সত্য-সত্যই আচরণ করতে প্রস্তুত হতে পারব। সেই

দিনই আমরা জানতে পারব যে, জনসঙ্গ ত্যাগ ও বৈরাগ্যই হল এই সাধনের প্রথম পদক্ষেপ। সেদিন আমরা নিশ্চিত ভাবে অনুভব করতে শিখব যে, সর্ব্বত্যাগী ষড় গোস্বামী পাদগণের আনুগত্য করা এবং সর্বত্যাগের চরম শিখরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীব্রজদেবীগণের আনুগত্য করা, সর্বত্যাগ ব্যতীত কদাপি সম্ভব নয়। তখনই আমাদের জীবনে প্রকৃত রাগানুগা ভক্তির সাধানটি যথার্থভাবে শুরু হবে। তখনই আমরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, অন্ধতম কামময় জগতে যাবতীয় ভোগ সম্পদের মধ্যে অবস্থান করে, সূর্য্যের মত নির্মল উজ্জ্বল প্রেমময় গোপীদের কথা কেবল মাত্র শোনা যেতে পারে, গোস্বামী পাদগণের কথা কেবল মাত্র লেখনীতে লেখা যেতে পারে, বলা যেতে পারে, কিন্তু বিনা বৈরাগ্যে, বিনা বিষয় ত্যাগে, ঐ ভজনের একটুও অনুভব হতে পারে না। এ কথা সর্বথা সুদৃঢ় সত্য, ধ্রুব সত্য। সেই সাথে সাধন তত্ত্বটিরও প্রকৃষ্ঠ জ্ঞান থাকা চাই।

কারণ, প্রভু স্বয়ং বলেছেন-"সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।" অর্থাৎ সাধন ব্যতীত সাধ্য বস্তু পাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বৈরাগ্য সম্বন্ধেও প্রভুর উক্তি আরও স্পষ্ট-"বিনা সর্বত্যাগং ভবতি ন ভজনং হ্যসুপতেঃ" অর্থাৎ প্রাণপতি গোবিন্দের বিশুদ্ধ ভজন সর্ব্বত্যাগ ব্যতীত কোনমতেই সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদায় নাটকে বর্ণিত প্রভুর উক্তিতে দেদীপ্যমান ভাবে প্রমানিত যে, সর্বপ্রকার বিষয় ভোগের স্পৃহা ও সর্ব্বপ্রকার বিষয় ভোগের সংস্রবকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করার পরই প্রভুর হার্দ্য-সাধনটি যথার্থভাবে রূপায়িত হতে পারে।

পন্ডিত বাবার জীবন-চরিতের মধ্যে বৈরাগ্য-পূর্ণ সুদৃঢ়

নৈষ্ঠিক-ভজনাদর্শের আলোতে আমরা রাগানুগা-ভক্তি মার্গের ভজনের অনেক তথ্য ও তত্ত্বই জানতে পারব, বুঝতে শিখব এই ভজনের প্রকৃত স্বরূপ ও তার যথার্থ মর্মকে। প্রভু কথিত সাধন সম্পর্কিত যে উক্তি আজ-"সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।" এ যে কতখানি অকাট্য ও অমোঘ বেদ বাক্য, তা জানা যায় রাগানুগা ভক্তিমার্গের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতের মধ্যে।

আপনি সবল হ'ন বা দুর্বল হ'ন, ধনী বা নির্ধনী হয়ে থাকুন, উচ্চবংশে জন্ম গ্রহ্ করুন বা নিম্ন কূলে জন্ম গ্রহণ করুন, আপনি বিশ-পঞ্চাশ হাজার শিষ্যের গুরুদেব হ'ন বা শিষ্য না করুন, আপনি বিশ-পঞ্চাশটি মঠের অধ্যক্ষ হ'ন বা কুটির বাসী হ'ন, সাধন বিনা সাধ্য বস্তু লাভের কোন বিকল্প ব্যবস্থা প্রভু দেননি। একমাত্র সাধনই সাধকের দিব্য অক্ষয় সম্পত্তি। সাধনের পরিমান দ্বারাই কৃপা লাভ হয়, বহু ব্যক্তিকে ধার্মিকের বেশে সজ্জিত করলেও এখানে তার জন্য প্রভু কোন রখম কমিশনের কোন ব্যবস্থাই রাখেন নি। এখানে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। নিজে সাধন যেমন করবেন, কৃপা সাধনের পরিমান অনুসারে তেমনই হবে। এটাই হল "সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাই পায়" এ কথার মর্ম। তারপর প্রভু বলেছেন-বিনা সর্বত্যাগং ভবতি ন ভজনং হ্যসুপতেঃ"।

সর্বত্যাগ ব্যতীত বিশেষতঃ রাগানুগা মার্গে বিশুদ্ধ সাধন হতেই পারে না। এখানেও প্রভু কোন বিকল্প ব্যবস্থা রাখেন নি। যেমন, প্রভুর নামে অর্থ সংগ্রহ, সেবার জন্য ধন-সম্পদ সংগ্রহ, প্রভুর জন্য মঠাদি নির্মান, উত্তম-উত্তম ভোগের বিপুল আয়োজন

করার জন্য ভিক্ষা, কিম্বা বৈরাগ্যের বেশ বা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে প্রসাদের দোঁহাই দিয়ে অতি সুখ সেবা সুখাদ্য ভোজন প্রভৃতিকে ভক্তির অঙ্গ যাজন বলে চালাবার যতই চেষ্টা করা যাক্ না কেন, এখানেও প্রভু কঠোরভাবে নিরপেক্ষ।

জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধেও প্রভু বলেছেন—

প্রভু কহে "সন্ন্যাসীর ভোক্ষ্য নহে উপকরন।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারন?"
"বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোহাঁর মলিন হয় মন।।"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

অতএব কোন অজুহাতই প্রভু শুনবেন না, বৈরাগীর বেশ, সন্ন্যাসীর বেশ কেবল জগতে পূজা গ্রহণের জন্য নয়, সমুদায় জন সম্পর্ক শূন্য হয়ে ভোগ ত্যাগ করে অনন্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করার জন্য। প্রভু স্বয়ং নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন। সন্ন্যাসী গ্রহণের পর প্রভু বলেছেন—

"এই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবন করিব নিভৃতে বসিয়া।"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

রাগানুগা মার্গে কিভাবে সাধন করতে হয়, তা শ্রীরূপ সনাতনাদি নিজ পরিকর দ্বরাও প্রত্যক্ষভাবে আচরণ করিয়ে প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন।

সুতরাং সাধন ব্যতীত সাধ্য বস্তু যেমন কখনই পাওয়া যায় না, তেমনই সর্বত্যাগ ব্যতীত সাধনও কখনও বিশুদ্ধ হতে পারে না, এ কথাও ধ্রুব সত্য। এ দুটো বস্তুর কোন বিকল্প ব্যবস্থা প্রভু কোথাও কাকেও দেননি।

আলোচ্য সিদ্ধ পন্ডিত বাবার জীবনে সেই সর্বত্যাগের ও

রাগানুগা ভক্তি মার্গের সাধনের অত্যুত্তম-আদর্শ আছে। ষড় গোস্বামী পাদগণের নির্ণীত রাগানুগা ভক্তির বিকাশ আছে, অতুলনীয় কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্ত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আছে বলেই, মাদৃশ জীব সর্বথা অযোগ্য হয়েও এই রচনাটি লেখার প্রয়াস করেছি। তবে ভক্তিমার্গে প্রতিষ্ঠিত জীবন মহাপুরুষগণের চরিত্রে এই শিক্ষাই আমরা পেতে পারি যে, যিনি যতটা শ্রীহরির কৃপার উপর নির্ভরশীল ও ধন-জনের অপেক্ষা শুন্য হয়ে থাকেন, তিনি ততটা প্রভুর কৃপা লাভ করেন ও শ্রেষ্ঠ সাধু, শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এ বিষয়ে ভগবান শ্রী গৌর সুন্দর স্বয়ং উপদেশ করেছেন—

"বৈরাগী হঞা সেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।।"

অর্থাৎ যাঁরা সর্বত্যাগী বৈরাগী হয়েও ধন ও ধনশালী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা করেন অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক দ্বারা সাহায্য গ্রহণের অপেক্ষা করেন, ভগবান তাঁদের কৃপা করেন না, পরন্ত উপেক্ষা করেন। কিন্তু যাঁরা কেবলমাত্র ভগবানের কৃপাকেই অপেক্ষা করেন, সেই সাধুগণ অবশ্যই প্রভুর কৃপা লাভে কৃতকৃত্য হয়ে থাকেন। এই কারণে নিরপেক্ষ শুদ্ধ বৈরাগ্যের আদর্শই এখানে স্থূনানি খনন-ন্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের উপরেই বৈরাগ্য ও ভজন সম্পর্কে আলোচনা করার যে চেষ্টা করা হয়েছে, দীনবৎসল বৈষ্ণবগণ ও করুনাসিন্ধু ভক্তবৃন্দ ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন এই প্রার্থনা রইল সকলের চরণে।

এই গ্রন্থ প্রনয়ন ও প্রকাশ বিষয়ে যে সকল মহানুভবের কাছে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

নিবেদন করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে সুবিখ্যাত রচনা 'শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান' প্রনেতা শ্রীধাম নবদ্বীপ স্থিত শ্রীহরিবোল কুটিরের মহামহোপাধ্যায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রী হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের লিখিত 'শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন' দ্বিতীয় খন্ডে-'সিদ্ধ পন্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ দাস বাবা' শিরোনামে পরম পূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রী পন্ডিত বাবার সম্বন্ধে যে রচনা আছে, তা এখানে সাদর শ্রদ্ধা সহকারে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া সিদ্ধ পন্ডিত বাবার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতি মোতি দেবীর সম্পর্কে নাতি জয়পুরবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত হরি নারায়ন শর্মাজী মহোদয় (এম.এ) লিখিত গ্রন্থে পন্ডিত বাবার জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এই রচনার মধ্যে আমি তা স্থান বিশেষে উল্লেখ করেছি।

সিদ্ধ পন্ডিত বাবার অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীশ্রী কৃপাসিন্ধু দাস বাবার লিখিত 'অচিন্ত্য চিন্তামনি' থেকেও পন্ডিত বাবার জীবন-বৃত্ত সম্বন্ধে এখানে গৃহীত হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের শ্রীচরণে জানাই অসংখ্য প্রণাম।

এই পুস্তকের প্রুফ্ সংশোধন-রূপ জটিল কার্য্যটি যিনি সুসম্পন্ন করেছেন এবং এই রচনার মূল বিষয়টি সামগ্রিক ভাবে অবলোকন করে যিনি তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ বহুমূল্য অভিমত দান করে এ অধমকে অনুগৃহীত করে পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, পরম পূজ্যপাদ পন্ডিত প্রবর শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ দন্ডবৎ প্রনামের সাথে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

'শ্রীভাগবত নিবাস' আশ্রমের সম্পাদক ও পরিচালক পরম

প্রীত্যাস্পদ শ্রীমৎ শুকদেব দাসজী মহারাজের আন্তরীক উদ্যোগই এই পুস্তক রচনার অন্যতম কারন, প্রভুর কৃপামৃত ধারায় তাঁর জীবন পরিনিষিক্ত হোক প্রভুর শ্রীপাদ পদ্মে এই প্রার্থনা জানাই।

এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে যাঁরা অর্থানুল্য করে সহায়তা করেছেন তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সাথে এখানে উল্লেখ্য মনে করি।

ভক্ত প্রবর শ্রীযুক্ত ব্রজসেবক দাস মহোদয় (বিজয় স্যার) (এম.এস.সি. এপ্ল্যায়েড্-ম্যাথামেটিক্স্-প্রথম শ্রেণী), (পোলোড়া, ডোমজুড়-হাওড়া, ৪১০১) ভক্তিমতি মহিলা শিক্ষিকা লাভলী মাঝি, জঙ্গল পাড়া, হাওড়া, ২০০০, অবশেষে সম্পূর্ণ অর্থানুকুল্য করেছেন- পরম প্রীত্যাস্পদ ভক্ত প্রবর শ্রীমান সত্য নারায়ন ঘোষ মহোদয়, নেতাজী নগর, কোলকাতা-৭২।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ পদ্মে প্রার্থনা করি এঁরা সকলে সুদুর্লভা ভাগবতী-রতি লাভ করে সুদুর্লভ মানব জীবন ধন্য করুন, এঁদের প্রত্যেকের সুকশল কল্যাণ কামনা করি।

এই রচনার ডি.টি.পি. করে সহায়তা করেছেন শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্যাম সুন্দর বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পরম প্রীতাস্পদ পন্ডিত প্রবর শ্রীমৎ সত্যচরণ দাস জী মহারাজ ও শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীমান শম্ভু চন্দ্র নাথ মহোদয়, ইহাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

সর্বশেষে নিবেদন এই যে, এই পুস্তকের মধ্যে হয়তো অনেক কথার পুনরাবৃত্তি থাকতে পারে। সুধীগণ জানেন পুনরাবৃত্তি সাহিত্যের ক্ষেত্রে দোষের হয় এবং শ্রুতি কটু লাগে। কিন্তু অধ্যাত্ম সাহিত্যে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তির অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা

স্বীকার করা হয়েছে। যেমন-“আবৃত্তি রসকৃৎ উপদেশাৎ” (ব্রহ্মসূত্র- ৪। ১। ১) এই ব্রহ্মসূত্রে সাধ্য-সাধন সম্পর্কিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। আবার স্থূনানি খনন ন্যায় অনুসারেও কোন দুরূহ তত্ত্বকে বুঝাবার জন্যও একই বিষয়ের বারম্বার আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। তথাপি রচনার মধ্যে অবাঞ্ছিত পুনরাবৃত্তি হলে সুধীগণ অবশ্যই ক্ষমা করে এর সার গ্রহণ করলে পরিশ্রম সার্থক মনে করব। ইত্যলম্

জয় শ্রীরাধে !

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব দাসানুদাস ঃ দীন সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ দাস

।। অবতরণিকা ।।

বন্দেগুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।।

সর্ব্বপ্রথমেই আমি শ্রীভগবন্মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরুকে এবং ভগবদ্ভজন সম্পর্কিত সকল শিক্ষাগুরুগণকে বন্দনা করি, ভগবানের প্রধান ভক্ত শ্রীবাসের সহিত নিখিল ভক্তগণকে বন্দনা করি, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যাদি প্রভুর অংশাবতারগণকে কোটি প্রণাম করি, শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রভুর সাক্ষাৎ প্রকাশগণকে কোটি কোটি প্রণাম করি, শ্রীগদাধরাদি প্রভুর নিজশক্তিবর্গকে সহস্র সহস্র প্রণাম করি, স্বয়ং ভগবান্ পরতত্ত্ব সার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনন্ত প্রণাম জানাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত এক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যাঁদের হৃদয়ে ভগবান শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজমান থাকে, এই প্রকার মহান্ বৈষ্ণবগণের কথা শ্রবণ বা তাঁদের বিশুদ্ধ আদর্শজীবনের গুণানুবাদ শ্রবণই মানবগণের সুদীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য। ইহাই পণ্ডিতগণের সুনির্ণীত ও সুচিন্তিত অভিমত।।

যথা— **শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য**
নন্বঞ্জসা সুরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।

তত্ত্বদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্।।

(শ্রীমদ্ভাগবত-৩/১৩/৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেছেন যে, "এতাদৃশ বৈষ্ণবগণের কথা শ্রবণ ব্যতীত বিদ্বান্‌গণেরও বিদ্যা বিফল হয়ে থাকে।"

"বৈষ্ণবকথা শ্রবণং বিনা বিদুষামপি বিদ্যা বিফলা ভবতীতি।"

(সারার্থদদর্শিনীটীকা)

মাদৃশজীব সর্ব্ববিষয়েই অযোগ্য, তৎসত্ত্বেও কেবলমাত্র বৈষ্ণব আদেশ শিরোধার্য্য করে বৈষ্ণবগণেরই শ্রীচরণরেণুর কৃপার উপর ভরসা রেখে এই রকমই এক মহান্ বৈষ্ণবের জীবন-চরিত রচনার দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

সমগ্র ব্রজমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেণীর বৈষ্ণব-সমাজে যাঁর নাম আজও অতি শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হয়ে থাকে, যাঁর মহাবৈরাগ্যের নির্ম্মলতা, সাধন-নিষ্ঠার সুদৃঢ়তা, শ্রীভগবদ্ভজনে অনন্যতা, পাণ্ডিত্যে নিপুণতা, সাধ্য-সাধন তত্ত্ববিচারে দক্ষতা, সর্ব্বত্র উদার সমদর্শিতা, আজীবনকালব্যাপী ব্রজবাস-নিষ্ঠা এবং কেবলমাত্র ব্রজবাসীগণের শুদ্ধ মাধুকরী-বৃত্তির উপরেই আমরণকাল জীবন-নির্বাহ প্রভৃতি যে অত্যুজ্জ্বল আদর্শকে যিনি অটুটভাবে প্রদর্শন করে সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ও সমস্ত ব্রজবাসীবৃন্দের নিকট "শ্রীশ্রীপণ্ডিত বাবা' নামে আজও সুবিখ্যাত হয়ে আছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় ব্রজভূষণ বিরক্ত চূড়ামণি, সিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

দাস বাবাজী মহারাজের মহাবৈরাগ্যময় বিশুদ্ধ ভজনাদর্শে সমুজ্জ্বল চরিত বর্ণনা করা বস্তুতঃ পক্ষে মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবাধমের ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হয়।

তথাপি লিখতে বসেছি যদি পরশমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়, এই লোভেই আরম্ভ করছি পরমপূজ্য শ্রীপাদ পণ্ডিত বাবার অধ্যাত্ম-জীবনের ইতি বৃত্ত্য। এই রচনার প্রবৃত্তির আর একটি কারণ হল, এই মহাপুরুষের মধ্যে যে বৈরাগ্য, যে ভজনাদর্শ দেখা গেছে তার মধ্যে আমাদের প্রচুর শিক্ষার বিষয় আছে, যা আজকের দুর্দিনে বৈরাগ্যের যে খরা চলছে, এমন অবস্থায় বৈরাগ্যের মূর্ত্তি পণ্ডিত বাবার চরিত্র আজ আমাদের অনেক সাহস ও উৎসাহ যোগাতে পারে।

আমার শ্রীগুরুপাদ্মের শ্রীমুখে শুনেছি যে, "পণ্ডিত বাবার বৈরাগ্য-বিভূষিত স্বরূপটি দর্শন করলে ষড় গোস্বামীপাদগণের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়"। আমি তখন ষড়্গোস্বামীপাদগণের অন্যতম, সম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী পাদের প্রতিষ্ঠিত" শ্রীশ্রীমদন মোহন জীউ প্রাচীন মন্দিরেই থাকতাম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় থাকাকালীন সময়ে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ মদনগোপাল ব্রহ্মচারীজী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট সৎসঙ্গের লোভে প্রায়ই আসতেন, আমিও অবসর সময়ে শুনতাম, তাঁকেই মহারাজ উপরোক্ত কথাটি বলেছিলেন।

তাই আজ ভরসা করেই লিখছি যে, সমগ্র ব্রজমণ্ডলে সুবিখ্যাত পণ্ডিত বাবা ছিলেন ষড়্‌গোস্বামীপাদগণের আদর্শের প্রতীক্। এই সকল কারণেই এই 'চরিত' লেখার উদ্দেশ্য। ভজন-নিষ্ঠ বৈরাগ্য-জীবন মহাপুরুষের জীবনী লিখতে গেলে ভজন সম্পর্কিত কিছু শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের আলোচনারও প্রয়োজন হয়। অজ্ঞ, মুর্খ, ক্ষুদ্র জীব আমি, আমার সে যোগ্যতা না থাকলেও তার যৎ সামান্য প্রয়াস করা হয়েছে। এজন্য সমগ্র বৈষ্ণবগণের নিকট ও ছোট বড় সকল ভক্ত গণের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা জানাই, রচনার মধ্যে ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে করুণাসিন্ধু গৌরভক্তগণ নিজগুণে এদাসাধমকে কৃপা করলে ধন্য হব।

ইতি

।। জয় শ্রীরাধে ।।

বিদ্বদভিমত

শ্রীগুরবে নমঃ

পরম প্রীত্যাস্পদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীগৌরাঙ্গ দাসজী মহারাজ আচার্য্যবর্য্য ষড়গোস্বামীগণের শাস্ত্রসিদ্ধান্তের আলোকে পরম পূজ্য পণ্ডিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দাস সিদ্ধ বাবার জীবন চরিত্রকে উদ্‌ভাসিত করেছেন, তাহা অতি সুন্দর হইতেও সুন্দর হয়েছে। শ্রীশ্রীসিদ্ধ বাবার জীবন চরিত পাঠ করিলে সাধক প্রকৃত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি ও রাগানুগা মার্গের সাধনের রহস্য জানিতে পারিবে এবং তদনুসারে সাধন করিলে শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের সেবামৃত লাভে ধন্য হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্তিতীর্থ ভূতপূর্বক অধ্যাপক

এম, এ, পি, এচ, ডি বিভাগ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট,

রমণরেতি, বৃন্দাবন।

তাং-

অদ্বৈত সপ্তমী

২৬/১/২০১৫

পণ্ডিত সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

সিদ্ধ পণ্ডিত বাবা শ্রীল রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ কুলীন গৌড় ব্রাহ্মণ বংশে ১৯১৪ সম্বতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্রমাসে জয়পুরের অন্তর্গত ভুরাটিপা পঞ্চগলিতে শ্রীমতী কমলাদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পুর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীরামপ্রতাপ শর্মা, আট বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, পিতা পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা ছিলেন রামানন্দী বৈষ্ণব এবং মাতা বল্লভ কুলের কন্যা, সুতরাং বল্লভকুলী সম্প্রদায়েই দীক্ষিত ছিলেন। ইঁহার পিতামহ রামানুজীয় বৈষ্ণব ছিলেন, শোনা যায়—তিনি অশ্বারোহী শ্রীরঘুবীরের দর্শন করেছিলেন।

ইঁহারা জয়পুরের রাজগণের অধ্যাপক বংশ। এখানে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়—পিতামহ রামানুজীয় বৈষ্ণব, পিতা রামানন্দী বৈষ্ণব, মাতা বল্লভকুলে দীক্ষিত। তথাপি পরস্পরের মধ্যে ভাবের কোন বিরোধ ছিল না।

বস্তুতঃ পক্ষে ধর্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে যথার্থ জ্ঞান হলে ধর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হতেই পারে না। বর্ত্তমানে তো একই সম্প্রদায়ের মধ্যে কতরকম নূতন নূতন মতবাদ তৈরী হচ্ছে, কত মত বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, সাধন সম্পর্কে উপাস্য উপাসনা সম্পর্কে কত নূতন মতের প্রচার হচ্ছে

তার ইয়ত্তা নেই। অথচ তাঁরা সকলেই বলেছেন ইহাই মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম। ইহাই যুগোপযোগী ধর্ম। এই সকল নূতন মত সৃষ্টি মত বিরোধের একমাত্র কারণই হল ধর্মতত্ত্ব ও ভগবতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অভাব।

ষড় গোস্বামীপাদগণের অন্যতম দার্শনিক আচার্য্য শ্রীমৎ জীব গোস্বামীপাদ প্রীতি সন্দর্ভের প্রথমেই লিখেছেন—"**দোষমূলং হি জীবানাং পরতত্ত্বজ্ঞান অভাব এব**" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দোষের একমাত্র মূল কারণই হল সর্ব্ব জ্ঞানের সার শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব।" সুতরাং অজ্ঞতার ভিতরে ভ্রম আর বিরোধ থাকবেই। প্রখর সূর্য্যালোকের ভিতর যেমন অন্ধকার থাকতে পারে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যেও কোনও প্রকার বিরোধ বৈষম্যভাব থাকতে পারে না। তাই মাতৃদেবী বল্লভকুলী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হলেও ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ দেবজীর প্রতি তাঁর অত্যাধিক নিষ্ঠা ছিল। রামপ্রতাপজীর বাল্য-জীবন মাতৃদেবীর শুদ্ধ স্বভাব-সংস্কার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে থেকেই ভক্তিতে বিশেষ আগ্রহ দেখা যেত। প্রায়ই মাতৃদেবীর সাথে ঠাকুর শ্রীগোবিন্দদেবজীর দর্শনে যেতেন।

ভগবান শ্রদ্ধালু শুদ্ধ-সরল-হৃদয়কে সর্ব্বকালেই বেশী পছন্দ করেন। রামপ্রতাপজী ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবের অহৈতুকী কৃপার পরশ লাভ করে বাল্য জীবনেই ধন্যাতিধন্য হয়েছিলেন।

একদিন রামপ্রতাপ সাথী বালকদের সাথে গুলি খেলছিলেন। ভগবান গোবিন্দদেবজী খুব রসিক, তিনি এক বালকের রূপ ধারণ করে রামপ্রতাপজীর সাথে খেলতে শুরু করে

দিলেন। কিছুক্ষণ খেলার পর ঠাকুরজী জয় লাভ করার সাথে সাথেই চট্‌পট্‌ রামপ্রতাপের সব কয়টিগুলি নিয়ে মন্দিরের দিকে দ্রুতগতিতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রতাপী রামপ্রতাপজীও ছাড়ার পাত্র নন, তিনিও বালকবেশী ঠাকুরের পিছু নিলেন, সকলেই জানেন বাল্যকালে বালকের খেলার বস্তুটি কত প্রিয় হয়।

ঠাকুরজী মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এদিকে রামপ্রতাপজীও মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে মন্দিরের প্রহরী ও তুলসীসেবক বা দ্বারসেবক বাধা দিলেন। কিন্তু নিরূপায় হয়ে খেলার গুলীর জন্য ক্রন্দনরত অবস্থায় চিৎকার করতে করতে মন্দিরে ভিতরে যাওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ জেদ প্রকাশ করতে লাগলেন। সেই সময়ে কিছু ভিড়ও জমে যায়। এমন সময়ে চীৎকার চেঁচামেচী শুনে মন্দিরের প্রধান সেবাইত শ্রীকিশোরীমোহন গোস্বামীজী সেখানে আগমন করে বালক রামপ্রতাপজীকে স্নেহমাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে তখন রোরুদ্যমান রামপ্রতাপ সব কথা শোনালেন—'গোবিন্দ নামে এক বালক আমার সাথে গুলি খেলছিল, সে আমার গুলি নিয়ে মন্দিরের ভিতরে লুকিয়ে পড়েছে, আমার গুলি দিতে হবে।' গোস্বামীজী মন্দিরের ভিতরে গিয়ে আবাক্‌ হয়ে গেলেন, ঠাকুরজীর পরিহিত বস্ত্র সব এদিক-ওদিক হয়ে আছে, তাঁর চরণের নীচে কয়েকটি গুলি রাখা আছে, তিনি গুলি কয়টি নিয়ে বালক রামপ্রতাপজীর হাতে তুলে দিলেন।

এই রহস্যের মর্ম বুঝতে তাঁর কিছু বাকি রইল না, তখন গোস্বামীজী গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—বালক! তোমার জীবন

ধন্য, তোমার ভাগ্যের মহিমা বলার কোন ভাষা নেই। ঠাকুর গোবিন্দদেবজী স্বয়ং তোমার সাথে গুলিখেলা খেলেছেন, অহো তুমি ধন্য! তুমি ধন্য! বলতে বলতে বালককে হৃদয়ে ধারণ করে তিনিও ভাব বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

পণ্ডিত বাবার অন্তরঙ্গসেবক শ্রীকৃপাসিন্ধু বাবার 'অচিন্ত্য-চিন্তামণি' নামক গীতি রচনায় এই গুলি খেলার কথা বর্ণনা আছে। যথা—

"যাঁকে অতি শিশুকালে, গুটিকা খেলার ছলে,
শ্রীগোবিন্দ অতি কৃপা কৈলা।
দেখিয়া শিশুর গুণ কাকাজী কিশোরী মোহন,
স্নেহে তুলি হৃদয়ে ধরিলা।।"

সুতরাং এটা কোন অতি রঞ্জিত কল্পিত কাহিনী নয়। যে সকল মহাপুরুষগণ তাঁদের বিশুদ্ধ সরল হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাসের সুদৃঢ় সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের পবিত্র জীবনে বাল্যকালেই কৃপাময় প্রভুর কৃপার স্পর্শ লাভ হয়। কুতার্কিকগণ কখনও তার কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসে এরকম অনেক ভক্তের চরিত্রে তার বহু প্রমাণ্ আছে। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত এক শ্লোকে এ রকম সিদ্ধান্তই জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, "সরলচিত্তে যাঁরা সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরি-পাদপদ্মকেই অনন্যভাবে আশ্রয় করেন, সর্ব্বতোভাবে তাঁকেই নির্ভর করেন, তাঁদের কাছে ভগবান্ শ্রীহরি অতিসুখলভ্যই হয়ে থাকেন, সুতরাং কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি এমন গুণের প্রভুকে সেবা না করেন?

কিন্তু যাঁরা কুটিল চিত্ত, ভগবদ্বিশ্বাসের দৃঢ়তা নেই, বিষয়-সম্পদের উপরেই যাঁদের জীবন দাঁড়িয়ে থাকে, তাঁরা যতই সাধন করুন, বাহিরে নিয়ম নিষ্ঠা করুন, সর্ব্বচিত্ত জ্ঞাতা ভগবান্ তাঁদের অসাধু মনে করেন, তাঁদের কাছে ভগবান্ একেবারেই দুরারাধ্য।"

যথা— **"তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ।**
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দূরারাধ্যমসাধুভিঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত-৩/১৯/৩৬)

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণে স্পষ্ট জানা যায় যে, ভগবানকে পেতে মাত্র দুটি গুণেরই দরকার হয়। চিত্তের সরলতা, আর ভগবানের প্রতি সুদৃঢ়বিশ্বাস, অর্থাৎ সর্ব্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভগবানকেই নির্ভর করা, ব্যস, এতেই প্রভু আপনাকে কৃপা করার জন্য প্রস্তুত আছেন। বিশ-পঞ্চাশটা শিক্ষার ডিগ্রীরও প্রয়োজন হয় না, আর দশ-বিশটা ভাষায় পারদর্শী হওয়ারও দরকার হয় না, রাশি রাশি মিষ্টান্ন পক্কান্নেরও আবশ্যক হয় না।

কিন্তু জগত চিরকালই আড়ম্বরকেই বেশী পছন্দ করে, আড়ম্বর বহুল বৈভব-প্রাচুর্য্যকেই অনেকে উত্তম ধর্ম বলেও মনে করেন। সুতরাং সেখানে তাঁদের জীবনে ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎ কৃপার সন্ধান পাওয়া সুদূর পরাহতই হয়ে থাকে।

ভগবদাশ্রিত জীবন যাঁদের, তাঁদের সর্বক্ষেত্রেই একটা স্বাভাবিক নির্ভীকতা থাকে। বাল্যকালে রামপ্রতাপের চরিত্রেও তা প্রকাশ পেয়েছিল। তখন বয়স সাত কি আট বৎসর হবে, দূরবর্ত্তী মাধবপুরের এক ঝরনা থেকে শ্রীকৃষ্ণপূজার জন্য জল আনয়ন

করতে নিত্য একাকী যেতেন। একদিন পথে দেখলেন একটি বাঘ এক মানুষকে ভক্ষন করছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি দেখেও ভীত হলেন না, অকুতোভয় চিত্তে সেই পথেই গমন করে জল নিয়ে এলেন। তাঁর স্বাভাবিক ধারণা হয়েছিল বাঘ যখন তার খাদ্যদ্রব্য পেয়েছে তখন আবার তাঁকে আক্রমণ করবে কেন? কি অদ্ভুত সরল ভাবনা।

আমরা প্রথমেই নিবেদন করেছি যে, শ্রীরামপ্রতাপজী জয়পুর রাজগণের অধ্যাপক বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই বাল্যকাল থেকেই ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। আর যিনি সৎসংস্কার নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন, শাস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ থাকারই কথা, মাত্র নবমবর্ষেই পানিনী ব্যাকরণ শেষ করেন।

এই সময়ে জয়পুরে আগত কর্ণাটি বিপ্র শ্রীনৃসিংহ দাসজী মহারাজের সাথে ইঁহার আলাপ পরিচয় হয়। তাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল সম্ভবতঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ভট্ট। এইজন্য জয়পুরে ওনাকে ভট্টজী নামেও অনেকে সম্বোধন করতেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই শ্রীনৃসিংহ দাসজী ষড়দর্শনের পণ্ডিত, বীণাদি বাদ্য যন্ত্রে সুনিপুণ এবং সঙ্গীত বিদ্যাতেও অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। শোনা যায় তিনি যখন গৃহে ছিলেন, সেই সময়ে শ্রীগোবিন্দদেবজী তাঁকে স্বপ্নে আদেশ করেন— "তোমার মুখে সামবেদ গান শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর, সেখানে সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস

বাবাজী মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর।" স্বপ্নাদেশ পেয়ে শ্রীনৃসিংহ দাসজী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবার নিকট দীক্ষা ও বৈরাগ্য বেশ গ্রহণ করেন। শ্রীগোবিন্দদেবজীউ জয়পুরে আছেন শুনে জয়পুরে আসেন। ইনি সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবার শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বৃন্দাবনে না থাকায় বৃন্দাবনের মধ্যে বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না।

জয়পুরে শ্রীগোবিন্দদেবজীর মন্দিরে ইনি যখন আবিষ্ট হয়ে বীনাবাদ্যযন্ত্রে সামবেদ গান করতেন এবং মধ্যে মধ্যে কখনও আবার শ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাদির গানেও আবিষ্ট হতেন, তখন তাঁর গন্ধর্বের মত মধুর কণ্ঠে গান শুনে সমস্ত ভক্তবৃন্দ, সজ্জন জনতা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ইহার গানে মুগ্ধ হয়ে জয়পুর অধিপতি মহারাজ শ্রীরামসিংহজী ও শ্রীগোবিন্দের সেবক শ্রীকিশোরীমোহন গোস্বামীজী তাঁকে অতি আগ্রহ সহকারে জয়পুরে বাস করান। এইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে তাঁর বিশেষ পরিচয় নেই।

শ্রীরামপ্রতাপজী ইহার গানে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনিও এনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে এক নিবিড় স্নেহসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য ইঁহার মুখে স্বগুরু সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবার মহিমা শুনে বৃন্দাবনে গমন করে উত্তর কাল তাঁকেই গুরুত্বে বরণ করেছিলেন। এক কথায় বলা যায় ইঁহার সংস্পর্শে আসার পর থেকেই শ্রীরামপ্রতাপজীর জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে, প্রকৃত সাধন-পথের সন্ধান পান, যেন নূতনভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের এক দিব্য আস্বাদ লাভ করেছিলেন।

বস্তুতঃ পক্ষে জীবনকে শুভ পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত করতে, সাধনের পথে চালিত করতে মহৎ সঙ্গই তার সর্ব্বোত্তম কারণ হয়। এই সিদ্ধান্তই ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থে বহুশঃ বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীনৃসিংহদাসজীর সাথে কয়েকদিন আলাপ করেই বুঝতে পারেন ইনি কেবল সঙ্গীত বিদ্যাতেই যে পারদর্শী তাই নয়, দর্শন শাস্ত্রেও ইঁহার বিরাট্ পাণ্ডিত্য আছে। ইঁহারই নিকট রামপ্রতাপজী বেদ ও কোষ কাব্য অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীনৃসিংহ দাসজী মহারাজের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই রামপ্রতাপজী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মহাত্মাগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। তখন থেকেই নিজের মনে মনে ভাবতেন যে, এই প্রতাপী বহুদর্শী বিদ্বানের যিনি গুরুদেব, তিনি নিশ্চয়ই মহামহীয়ানই হবেন।

এইভাবে শ্রীনৃসিংহ দাসজীর আন্তরীক স্নেহ সম্পর্কে আসায় রামপ্রতাপের অধ্যয়ন-জীবনের শুরুতেই আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চকোটি জ্ঞানলাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আবার ঐ সময়েই শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী কাকাজীর স্নেহ-সম্পর্কে আসায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত প্রফেসর শ্রীযুক্ত কান্তি চন্দ্র মুখার্জ্জী (সেন) মহোদয়ের সাথে আলাপ পরিচয় হয়। তিনিও রামপ্রতাপজীকে আগ্রহ সহকারে বাংলা ও ইংরাজী, উর্দু ভাষা শিক্ষা দিতেন। এই প্রফেসার কান্তিবাবু প্রথমে জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরাজী পড়াতেন, পরে স্কুলের প্রধান অধ্যাপক ও কলেজের অধ্যক্ষ এবং মহাসচিব হয়েছিলেন।

শ্রীরামপ্রতাপজী এই দুই উচ্চ কোটির শিক্ষকের সান্নিধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পারমার্থিক-জীবন গঠনের

ক্ষেত্রে কৈশোর জীবনের শুরুতেই প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। উচ্চকোটির বিশুদ্ধ ভজন করতে হলে উচ্চকোটির শাস্ত্রীয় জ্ঞানেরও অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ রাগমার্গের ভজনতত্ত্ব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে একথা অতি দৃঢ়তার সাথে জানানো হয়েছে।

যথা— **শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।**
মূঢ় লোকে নাহি জানে ভাবের বৈভব।। ইত্যাদি।
(চৈঃ চঃ আঃ ৬ পরিঃ)

যাই হোক ছোটেলাল পুরোহিতজীর নিকট যথা সময়ে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হলেন। সাবিত্রী দাতা ছোটেলালজী রামপ্রতাপের শুদ্ধ সংস্কার দেখে তিনি সাবিত্রী মন্ত্রের পুরশ্চরণ করার আদেশ দেন। তাঁর আদেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হয়ে সাতাইশ দিন মন্ত্র পুরশ্চরণ করে সাবিত্রী দেবীর দর্শন ও বর লাভ করেন।

এই সম্বন্ধে শ্রীকৃপাসিন্ধু বাবা লিখেছেন—

"দেখিয়া শিষ্যের ধাম, পুরোহিত মাতিমান, পুরশ্চর্য্যা উপদেশ দিল। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধর, বিংশতি সপ্তবাসর, সাবধানে গায়ত্রী জপিল। গায়ত্রী দেবী কৃপাবতী, অধিষ্ঠান হৈল তথি, যতনে যাচিয়া দিল বর। যাও বাছা বৃন্দাবন, কর কৃষ্ণ আরাধন, হবে কৃপা তোমার উপর।"

সাবিত্রীদেবীর সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হয়ে বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য উৎকন্ঠা অসীম ভাবে বেড়ে গেল। কিন্তু বৃন্দাবন যাওয়ার চেষ্টা করলেও মাতা ও রাজসরকার কর্ত্তৃক বারংবার অবরুদ্ধ হতে লাগলেন। কিন্তু যাঁর জীবনে কৃষ্ণ-কৃপা আর মহৎ কৃপা লাভের

সংযোগ ঘটে, তাঁকে সংসারের কোন প্রলোভন আর কৌশল দ্বারাই গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখা যায় না। সুতরাং মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই রামপ্রতাপ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

নিজের বিশুদ্ধ ভক্তির সংস্কার ও ষড়-দর্শনের আচার্য্য শ্রীনৃসিংহ দাসজীর সংস্পর্শে এসে তিনি ঐ বয়সেই বুঝেছিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগামী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যপাদগণের উপদিষ্ট সাধ্য সাধন সম্পর্কিত ভজন-তত্ত্ব অতি উচ্চ কোটির অতি বিশুদ্ধ উপাসনা।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনাদি বৈষ্ণবাচার্য্যপাদগণ প্রভুর নির্দ্দেশে ভক্ততত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব প্রেমরসতত্ত্ব, লীলারসতত্ত্ব এবং ব্রজ প্রেমরসতত্ত্বের অলৌকিক চমৎকারিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রধান গ্রন্থে তা নিরূপণ ও প্রতিপাদন করেছেন, তা যদি অনুভবী বিদ্বানের নিকট বিশেষভাবে শ্রবণ এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন না করা যায়, তাহলে প্রভুর প্রদত্ত যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল উদ্দিষ্ট তত্ত্ব উন্নত উজ্জ্বল রসগর্ভা কৃষ্ণভক্তির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না। অবশ্য একথা নিশ্চিত সত্য যে, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীবপাদত্রয়ের রচনার সাথে পরিচিত না হলে 'উজ্জ্বল রসের উপাসনা' সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণাই হতে পারে না। এই প্রকার স্থির নিশ্চয় করে তিনি সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা ও বৈরাগ্য বেশ গ্রহণের সংকল্প নিয়ে বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্র সকল অধ্যযন আরম্ভ করলেন।

শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের নিকট গোস্বামীদের আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গজী মন্দিরের শ্রীসুদর্শন শাস্ত্রীজীর নিকট ন্যায়, শ্রীনীলমণি গোস্বামীজির নিকট ষট্ সন্দর্ভাদি গোস্বামী গ্রন্থ,

সুরমাকুঞ্জের মহান্ত ও করোলীকুঞ্জের শ্রীনৃসিংহ দাসজীর নিকট টীকা সহিত শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীগোপীলাল গোস্বামীর নিকট শ্রীহরিভক্তি বিলাস অধ্যয়ন করেন। এইভাবে প্রায় সাত-আট বর্ষ ব্যাপী অধ্যয়ন করে বিশবর্ষ বয়সে শাস্ত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রীরামপ্রতাপজীর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মোতিদেবীর সম্পর্কে নাতি পণ্ডিত শ্রীহরিনারায়ণ শর্মাজীর (ডাবল এম এ) রচনায় জানা যায়—শ্রীরামপ্রতাপজীর আট বর্ষ বয়সেই পিতৃ বিয়োগ হয়। বড় ভাই শ্রীঘনশ্যাম শর্মাজীর আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। কিছু দিন বাদে এক ভগিনীরও প্রাণ বিয়োগ হয়। কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মতি দেবীও অল্প বয়সে বিধবা হ'ন। এই সকল কারণে শ্রীবৃন্দাবনে অধ্যয়ন কালে তিনবার জয়পুরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং কিছুদিন সংসারে বাসও করেছিলেন।

শ্রীরামপ্রতাপজীই বংশের একমাত্র পুত্র সন্তান। আবার পিতার এক জায়গীর অর্থাৎ জমিদারীও ছিল। যার একমাত্র উত্তরাধিকার হলেন এই রামপ্রতাপজী। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে মাতৃদেবীর একান্ত আগ্রহ ও অনুরোধে এবং অপর দিকে রাজবংশের অধ্যাপক-বংশ হওয়ায় রাজ সরকারের চাপে রামপ্রতাপজীকে বিবাহ-বন্ধনে বাধ্য হতে হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর সংসার-জীবন বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। তৎকালীন দিনে ঐ সমাজে বাল্য বিবাহের প্রথা ছিল। তাই অনুমান ১৫-১৬বৎসর বয়সেই বিবাহ হয়েছিল। এর মধ্যে তিনবার বৃন্দাবনে পলায়ন করেছিলেন।

একদিকে বৃন্দাবনে বাস ও শাস্ত্র অধ্যয়ন, অপর দিকে মাতৃদেবীর একান্ত অনুরোধ, এই সমস্ত কারণে বৃন্দাবন থেকে জয়পুরে বারবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। পরিশেষে প্রায় ১৮-১৯ বর্ষ বয়সে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হলে সংসার থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং বৃন্দাবনেই বাস করার সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন, আর গৃহে ফিরে যাননি।

শাস্ত্রে বলা আছে— ভক্তি যদি অন্তরে সত্যকার উদয় হয়, তখন সাধকের গতিও অপ্রতিহত হয়। '**অহৈতুক্যপ্রতিহতা**' এ ভক্তির সাধারণ ক্ষমতা, তাই এতখানি প্রতিকুলতা থাকা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক চাপের কাছে মাথা নোয়ালেন না। এটাই আজ আমাদের বড় শিক্ষার বিষয়।

একজন কৃতী বিদ্যার্থীকে যেমন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু প্রশ্ন যতই কঠিন হোক না কেন, কৃতী ছাত্র সমস্ত পরীক্ষাতেই অত্যন্ত সম্মানের সাথেই সহজে উত্তীর্ণ হয়ে যান। তেমনই রামপ্রতাপজীকেও তাঁর সাধক-জীবনে অনেক কঠিন পরীক্ষাই দিতে হয়েছিল। মানুষের জীবনে বহু-বাঞ্ছিত বস্তু সমাজে বিপুল সম্মান এবং পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর সাহচর্য্য সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করা যে সংসারে কত কঠিন কাজ, আশা করি তার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বর্ত্তমানে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞাপনের যুগে জগতের মধ্যে সর্ব্বপূজ্য বৈরাগ্যের বেশ গ্রহণ করে সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে দশ-বিশটা মঠ-মন্দির তৈরী করা বা দশ বিশ হাজার শিষ্য সেবক সংগ্রহ করা বড় বাহাদূরীর

কাজ নয়। তার চেয়ে অনেক বড় বাহাদূরীর কাজ অনেক কঠিন কাজ হল নিজের জীবনে বিশুদ্ধ সাধুত্ব অর্জন করা, শাস্ত্রীয় পন্থায় পবিত্র সাধু-জীবনযাপন করে ঐকান্তিকভাবে ভগবান্ শ্রীহরির উপাসনা করা।

কিন্তু কালের গতি অতি বিষম, বর্ত্তমানে সাধুর সাধুত্বের উৎকর্ষতা নির্ণীত হয় সাধুর বৈভব-প্রাচুর্য্যের পরিমান দ্বারা। অথচ শাস্ত্রের বিচারে শ্রীভগবন্নিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের আদর্শই সাধুর মহত্ত্ব। প্রভু স্বয়ং শিক্ষা দিয়ে জানিয়েছেন "**প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।**" শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভ করাই সাধু জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। ভগবৎ প্রেম ব্যতীত সাধুর জীবন ব্যর্থ, সে জীবন দরিদ্র-জীবন, যে জীবনে ভগবানের কৃপা লাভ হয় না, যে জীবনে নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমের ছোঁয়া লাগে না। বস্তুতঃ পক্ষে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়াচার্য্য বর্য্য শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদি গোস্বামীপাদগণের আনুগত্যে জীবনকে সর্ব্বত্যাগের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে, দৈন্যাত্মিকা প্রেমভক্তি লাভ করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। যা আজকের দিনে অতি বিরল হয়ে পড়েছে।

যাই হোক অনমনীয় অটুট মনোবল আর অনলস অধ্যাবসায়ের চেষ্টায় অবশেষে রামপ্রতাপজী সংসারের বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে বৃন্দাবনে স্থিত হয়ে সমস্ত গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করলেন।

এই প্রকার সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে দীক্ষা ও বৈরাগ্য বেশ গ্রহণ করেন। তখন থেকে শ্রীরামপ্রতাপজীর নাম

পরিবর্ত্তিত হয়ে নাম হল—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস। ব্রজমণ্ডলে আজও তিনি সিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ বাবা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

শ্রীগুরুদেবের নিকট ভজন বিষয়ক যাবতীয় উপদেশ লাভ করে রাগানুগামার্গে সিদ্ধ দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা চিন্তন রূপ সাধনে দৃঢ় সংকল্পে ব্রতী হলেন। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ ও গোস্বামী গ্রন্থ অনুশীলনের ফলে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের নির্দ্দেশে ও উপদেশে লিখিত শ্রীমৎ কবিরাজের শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ বর্ণিত শ্রীরাধা প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নৈত্যিক ব্রজচরিতের চিন্তনই হল রাগানুগা ভক্তিমার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মানসী সেবা। যথা—

"শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা,
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিত পরৈর্গাঢ় লৌল্যৈকভ্যা।"

ইত্যাদি দশ শ্লোকী লীলাসূত্রে শ্রীরূপপাদের নির্দ্দেশে শ্রীকবিরাজ এ কথাই জানিয়েছেন। আর ইহাই রাগমার্গীয় সাধকগণের অভিধেয়, মানসী সেবাই প্রয়োজন, একমাত্র গাঢ় লালসা দ্বারাই তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই প্রেম সেবা প্রাপ্তিই হল প্রয়োজনেরও প্রয়োজন। ইহা স্থির নিশ্চয় করে অনলস চেষ্টায় সমগ্র শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থকেই কন্ঠস্থ করলেন।

রাগমার্গীয় ভজন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং মননে সম্যক্প্রকারে শিক্ষা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশে গোবর্দ্ধনে গুটিকাওয়ালা সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজের নিকটে গেলেন। তাঁর কাছে শাস্ত্রের সাথে ভজনের সমন্বয় করার পর বর্ষানে গিয়ে একান্তভাবে নিশ্চিন্ত মনে ভজন

করার জন্য স্থির নিশ্চয় করলেন, আর সর্ব্বত্যাগের উপর জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বর্ষানের একান্ত স্থানে ভজনে প্রবৃত্ত হলেন।

পণ্ডিত বাবার জীবনে মূল ভজনাদর্শ রূপে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা চিন্তনই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। রাগমার্গীয় সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর এক শ্লোকে শ্রীরূপপাদ সাধক দেহে এবং সিদ্ধ দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার কথাই লিখেছেন।

যথা ঃ— **সেবা সাধক-রূপেন সিদ্ধ রূপেন চাত্রহি।**

তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।

(শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু)

অর্থাৎ এই ব্রজে নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ জনের মধ্যে যে কৃষ্ণভাব বা কৃষ্ণরতি আছে, তাহা লাভ করার জন্য লুব্ধচিত্ত যে সাধক, তিনি ব্রজলোকের আনুগত্যে সাধক রূপে যথাবস্থিত দেহে এবং সিদ্ধ রূপে তৎসেবোপযোগী সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করবেন।"

শ্রীরূপপাদ একথা বলার প্রথমে রাগাত্মিকা ব্রজবাসী নিত্য কৃষ্ণ পরিকরগণের ভাব প্রাপ্তির জন্য লুব্ধচেতা সাধকগণকেই এই রাগানুগামার্গের সাধনে অধিকারী নির্দ্দেশ করেছেন। পণ্ডিত বাবা যৌবনেই এই উপাসনায় যে যোগ্যতম অধিকারী ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচারের বিষয় এই যে, সর্ব্বত্যাগের সুদৃঢ় ভূমিতে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত বর্ণিত কৃষ্ণের ব্রজলীলাত্মক লীলা-চিন্তনকেই ভজনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ রূপে অবলম্বন করেছিলেন কেন? আর ভজন শুরু করার প্রথমেই

অতি যত্নসহকারে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে কণ্ঠস্থ করেছিলেন কেন? এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, সম্প্রতিকালে অনেক সাধকগণের মধ্যেই 'গুটিকা' নামক পদ্ধতিকেই অবলম্বন করতে দেখা যায়। অথচ শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়গোস্বামীপাদগণের নির্ণীত ভজন-উপদেশের সাথে এর কোন প্রকার সম্বন্ধ নেই। বর্ত্তমানে প্রকাশিত গুটিকা বর্ণিত যোগপীঠাদি সম্বন্ধেও একটি উপদেশও তাঁরা দেন নাই। এই কারনেই এখানে প্রমাণের সাথে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। যাতে রাগানুগা ভজন সম্পর্কিত যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পায়।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদের সমসাময়িক তৎকালীন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীহরিদাসজী মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে। একথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। তাঁরই শ্রীচরণাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীমৎ রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় সংক্ষিপ্ত লীলা-সূত্র দশ-শ্লোকীর ভাষ্য রচনা করেছেন। ঐ ভাষ্যের প্রথমেই তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শ্রীরূপপাদের নির্ণীত রাগমার্গ ভজন পদ্ধতি বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন বিশেষতঃ আজকের দিনে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত বৈষ্ণব ও সজ্জন ভক্তগণের তা একান্তভাবে জানা অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে। তাই এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেই বিবৃত করা হচ্ছে। যেহেতু শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্ গোস্বামীপাদগণের নির্ণীত ভজন-পদ্ধতি যথার্থ ভাবে এখানে জানানো হয়েছে।

যথা—"শ্রীরূপগোস্বামীনোঽপি (রসামৃত পূর্ব্ব ২/১৬১) "সেবা সাধকরূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।" ইত্যাদিনা তামেব ভক্তিং মুখ্যতয়া নিরূপ্য স্তোত্রাদি দ্বারেণ বহুধা প্রপঞ্চিতবন্তোঽপি রহস্যাতিরহস্যতয়া স্বগনাতিরিক্তেভ্যো গোপনায় নৈকত্র কুত্রাপি ক্রমেণ তদনুষ্ঠান প্রকারং নিরূপয়ামাসুঃ। যদা চ স্বীয়ানামাগ্রহেন তন্নিরূপণে প্রবৃত্তাস্তদৈব তেষাং ভগবৎ প্রাপ্তি সময় উপস্থিতো বভূব। তঞ্চ সময়ং স্বয়মেব জ্ঞাত্বা পরমাপ্ততমেভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহানুভাবেভ্যঃ সাঙ্গমেব তৎ প্রকারমুপদিশ্য ত্বয়ৈবৈতৎ প্রকাশনীয়মিতি তান্ প্রত্যাজ্ঞাপিতবন্তঃ।

তে চ তদাজ্ঞা পরধীনাঃ স্বীয়জন প্রার্থনা বশং গতাশ্চ সন্তস্তদেক প্রতিপাদক ভগবন্নৈত্যিক চরিত বর্ণনাত্মক শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতাভিধ মহাকাব্য রচনা ব্যাজেন যথোপদেশমেব তৎপ্রকারং নিরূপয়াম্বভূবুঃ।

পুনশ্চ তামেব ভক্তিমতি লঘুনোপায়েন সূত্রয়ন্তো দশ শ্লোকীং প্রণীতবন্তঃ। তত্রৈকেন প্রথমতঃ সর্ব্বমাথুর বৈষ্ণব সম্প্রদায় সিদ্ধ সিদ্ধান্তরহস্যং নিরূপনং।"

(দশ শ্লোকী ভাষ্য ভূমিকা)

অর্থাৎ এই রাগানুগা ভক্তি সাধনে ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জনগণের ভাবে লুব্ধ চিত্ত হয়ে, তাঁদের আনুগত্যে যথাবস্থিত দেহে এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত স্বাভীষ্ট সেবা উপযোগী দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় নিরত হবে।" ইত্যাদি কারিকা দ্বারা শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ সেই উন্নত উজ্জ্বল রসগর্ভা

ভক্তিকেই মুখ্যভাবে নিরূপণ করে স্তোত্রাদি রচনাপূর্ব্বক তারই বহুপ্রকার বিস্তার করলেও কিন্তু মহারহস্যত্ব হেতু নিজগণ ভিন্ন অন্যত্র গোপন করার উদ্দেশ্যে ঐ ভক্তির অনুষ্ঠান-প্রকার কোথাও এক স্থলে ক্রমপূর্ব্বক নিরূপণ করেননি।

যখন তিনি নিজ পরিকরগণের আগ্রহে উক্ত উন্নত উজ্জ্বল রসগর্ভা ভক্তির নিরূপণের সম্মত হয়ে রচনার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন তাঁর ভগবৎ প্রাপ্তিকাল উপস্থিত প্রায় বুঝতে পারলেন। সেই অন্তিমকালের কথা নিজেই অনুভব করে শ্রীপাদ রূপ তখন পরম বিশ্বস্ততম পাত্র শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহানুভবকে ঐ ভক্তির নিখিল অনুষ্ঠান প্রকার অশেষ বিশেষে উপদেশ করেন। আর আদেশ করলেন, —"তুমিই এই ভক্তিরহস্যের অনুষ্ঠান প্রকার বা পরিপাটী" প্রকাশ কর।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীপাদ তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য করে এবং নিজগণের প্রার্থনার বশবর্ত্তী হয়ে ঐ উন্নত উজ্জ্বল রসগর্ভা ভক্তিরই প্রতিপাদক শ্রীকৃষ্ণের নৈত্যিক চরিত্র বর্ণনাত্মক শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত নামক মহাকাব্য রচনার ছলে শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের উপদিষ্ট ভক্তিরহস্যেরই পরিপাটি প্রকার যথাযথ ভাবে নিরূপণ করেছেন।

বালক তুল্য অতি অজ্ঞব্যক্তিকেও অতি সহজ উপায় তা গ্রহণ করাবার জন্য পুনরায় ঐ ভক্তিরই প্রতিপাদক শ্রীকৃষ্ণের নৈত্যিক চরিত্র অবলম্বনে সিদ্ধান্ত সূত্রকারে এই দশশ্লোকী প্রণয়ন করেছেন। তার মধ্যে প্রথমেই প্রথম শ্লোকে তৎকালীন ব্রজমণ্ডলের সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়-সিদ্ধ সিদ্ধান্ত রহস্য নিরূপিত হয়েছে।" (দশ

শ্লোকী ভাষ্য ভূমিকা পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজকৃত বঙ্গানুবাদ)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের এই রচনায় জানা যায় যে, রাগানুগা ভক্তি মার্গের উন্নত উজ্জ্বল রসগর্ভা এই নিগূঢ় ভক্তি রহস্যটি একমাত্র শ্রীরাধা স্নেহাধিকা শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি সেবাপরা সখীগণের হৃদয়ে বিরাজিত, গুহ্যাতিগুহ্য অতি রহস্যময় উপাসনা। এই কারণে শ্রীরূপ পাদ নিজগণের অতিরিক্ত অন্যভক্ত বা অন্য সাধকগণ থেকে গোপন রাখার জন্য স্তোত্রাদি দ্বারা কিছু কিছু প্রকাশ করলেও, একত্রভাবে ক্রমপূর্ব্বক কোথাও বর্ণনা করেন নাই।

অবশেষে নিজগণেরই অনুরোধে প্রকাশ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন নিজের অন্তিম সময় জেনেই একমাত্র বিশ্বস্ততম ও যোগ্যতম পাত্র শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর উপর প্রকাশ করার জন্য এই বিরাট দায়িত্বভার অর্পণ করেন। সেই সময়ে নিজেই কবিরাজকে এই ভজনের যাবতীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বিশেষভাবে উপদেশও করেছিলেন। আর শ্রীরূপ পাদের সেই উপদেশ অনুসারে কেবলমাত্র রাগমার্গের সাধকগণের জন্যই শ্রীমৎ কবিরাজ ঐ ভক্তিরই প্রতিপাদক শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

এই সিদ্ধান্তটি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের উপসংহারে কবিরাজপাদ নিজেও স্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর লিখিত উক্তিই এর বড় প্রমাণ বলে আমরা মনে করি।

যথা— **"শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকাল্যা,**
শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততি র্ময়েয়ম্।

সেবাঽস্যযোগ্য বপুষানিশমাত্র চাস্যা,
রাগাধ্বসাধক জনৈ র্মনসা বিধেয়া।।

(শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত-১৩/৯৪)

অর্থাৎ শ্রীরূপগোস্বামীপাদের প্রদর্শিত উপদেশ অনুসারে শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় ব্রজলীলা বিলাস লিখিত হল, একমাত্র রাগমার্গের সাধকগণই স্বাভীষ্ট সেবোপযোগী অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহে দিবারাত্র মনের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা চিন্তন করবেন।"

সুতরাং শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে বর্ণিত এই শ্লোকের নির্ণীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং দশশ্লোকী ভাষ্যে লিখিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামীপাদের রচনার মর্মানুসারে অত্যন্ত স্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে, তৎকালীন শ্রীধাম বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণবগণের প্রার্থনায়, শ্রীরূপপাদের নির্দেশ অনুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান প্রতিপাদ্য তত্ত্ব, রাগমার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মানসে সেবা-চিন্তন-পদ্ধতি, কেবল মাত্র রাগমার্গীয় সাধকগণের জন্যই 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' মহাকাব্য গ্রন্থটি অতিযোগ্যতম পাত্র শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ রচনা করেছেন। সুতরাং কেহ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি ষড় গোস্বামীপাদগণের নিরূপিত রাগানুগামার্গে ভজন করতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই শ্রীমৎ কবিরাজপাদের শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থকেই অবলম্বন করতে হবে। অন্যান্য ভজন পদ্ধতি যতই থাক, তা কিন্তু শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীপাদগণের মত নয়।

অতএব সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাগমার্গাবলম্বী সাধকগণের সাধন-প্রণালী বা সাধন পদ্ধতিই হল শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থে বর্ণিত মানসে সিদ্ধ দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা চিন্তন। সুতরাং শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থই যে, শ্রীরূপ পাদের নির্নীত রাগমার্গীয় সাধকগণের ভজন পদ্ধতি, একথা অবিসংবাদিত সুস্পষ্ট সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত। আর এই কারণেই পণ্ডিত বাবা তৎকালীন সময়ে প্রচলিত থাকলেও কোন গুটিকাকেই তিনি অবলম্বন না করে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থকেই অবলম্বন করেছিলেন। এই সাধন যে, সর্ব্বত্যাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, পবিত্র হৃদয়ে ঐকান্তিক অনুরাগের সহিতই অনুধ্যেয় এবং "ব্রজদেবীগণের বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্তির জন্য লুব্ধচেতা সাধকগণই যে ঐ উপাসনায় অধিকারী, একথা আচার্য্যপাদ অতি স্পষ্টভাবেই বলেছেন।

শ্রীরূপ পাদের শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থটি ভক্তিতত্ত্ব ও সাধন তত্ত্ব সম্পর্কিত অতি অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত প্রধান গ্রন্থ। উক্তগ্রন্থে এই রাগানুগা ভক্তির সাধন সম্পর্কে বিচার করার সময় সাধকের যোগ্যতা ও অধিকারেরও বিচার করা হয়েছে।

যথা— **"রাগাত্মিকৈক নিষ্ঠা যে ব্রজবাসীজনাদয়ঃ।**

তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধ ভবেদত্রাধিকারবান্।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু—১।২।২৯১)

অর্থাৎ একমাত্র রাগাত্মিকা ভক্তিতেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্রজবাসীজনের শ্রীকৃষ্ণে যে প্রকার ভাব আছে, তা প্রাপ্তির জন্য লুব্ধচিত্ত ব্যক্তিই এই রাগানুগা ভক্তিমার্গের অধিকারী।"

সুতরাং এই উপাসনা যে সর্ব্ব সাধারণের উপাসনা নয়, সকল শ্রেণীর ভক্তগণের অনুষ্ঠেয় নয়, তা উক্ত শ্লোকের দ্বারা শ্রীরূপ পাদ সমগ্র ভক্তি-সাধক সমাজকে সুস্পষ্ঠভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই প্রকার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত সাধ্য-সাধনতত্ব বিচার প্রসঙ্গে শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদেও এই সিদ্ধান্তই উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে এই উপাসনা সম্পর্কে রায় রামানন্দ বলেছেন—এই উপাসনা অতি রহস্যময় উপাসনা। এখানে তার একটু দিগ্‌দর্শন দেওয়া হচ্ছে।

যথা—"মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা।।
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতিগূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।।
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।।
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।"
সখীভাবে যেই তারে করে অনুগতি।।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।।"
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।।

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৮ পরিঃ)

ইত্যাদি পয়ার গুলির মর্ম বিচার করলে এই সিদ্ধান্তই স্পষ্ট হয় যে, কেবল মাত্র বৈরাগ্যই নয়, কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্তই নয়, কেবল মাত্র সদাচার নিয়ম নিষ্ঠাই নয়, এ সবের অনেক অনেক উপরে গাঢ় লোভই হল এই উপাসনায় যোগ্যতা ও অধিকার বলা হয়েছে। সম্প্রতিকালে কোন কোন আচার্য্যপাদ যে অধিকার-বিচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, তা যে শ্রীরূপপাদের নির্ণীত ও শ্রীরায়রামানন্দ কথিত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট বিরোধী ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, এই প্রমানে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানা যায়।

সুতরাং এই রাগমার্গের উপাসনা যে আম-জনতার উপাসনা নয়, পঞ্চায়েতী সাধন নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে বৈকুণ্ঠ পরিকর থেকে শুরু করে দ্বারকা-মথুরা বাসী কৃষ্ণের নিত্য পরিকর গণেরও অধিকার হয় না, এমন কি ব্রজের মধ্যেও কেবলমাত্র মধুররসবতী সখীগণেরই একমাত্র অধিকার বলে জানানো হয়েছে, কেবলমাত্র সেই সখীভাব লাভের জন্যই যাঁরা লুব্ধচিত্ত হয়ে থাকেন, মাত্র সেই সাধকগণকেই এই সাধনে অধিকারী নির্দ্দেশ করা হয়েছে। ইহাই রাগমার্গের সংস্থাপক আচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের নির্ণীত সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত। **"তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান।"**

"ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদও লিখেছেন— **"রহস্যলীলা তু পৌরুষ বিকারবদিন্দ্রিয়ৈর্নোপাস্য স্বীয় ভাববিরোধাৎ"** অর্থাৎ "মধুর রসের ভক্ত হলেও রহস্যলীলা কিন্তু পৌরুষ ইন্দ্রিয় বিকার যুক্ত সাধকেরও উপাস্য নয়।" এই কারণে রায়রামানন্দজী সখীভাবে

শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই উপাসনাকে অত্যন্ত রহস্যময় সাধন বলেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সখীগণের যে চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্য এরূপ সর্বত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় না, শ্রীকৃষ্ণের জন্য এরূপ অতি উৎকট অনুরাগের কথা আর কোথাও শোনা যায় না, যা দেখে, যা শুনে মহাভাগবত ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত উদ্ধব স্তম্ভিত, বিস্মিত, অভিভূত হয়ে ব্রজ থেকে মথুরায় ফেরার সময়ে ব্রজগোপীগণের শ্রীচরণের রেণুকে বারম্বার বন্দনা করে গেছেন, তাঁদের চরণের রজঃ পাওয়ার জন্য বৃন্দাবনে গুল্ম-লতাদিতেও জন্ম প্রার্থনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীগণের হৃদয়ে যে আর্ত্তি, যে উৎকুন্ঠা, যে ক্রন্দন, যে বিলাপ উদ্ধবজী চোখে দেখেছেন, কানে শুনেছেন, ভগবানের অসংখ্য পরিকরগণের মধ্যে কোথাও দেখেন নি, কোথাও শোনেন নি, এযে লোকাতীত, শাস্ত্রের অতীত, সমগ্র শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অতীত এক বিস্ময়াবহ অদ্ভুত ভাব। মনের দ্বারা সেই ভাবের আনুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা চিন্তনই হল প্রকৃত রাগানুগাভক্তি। আর ইহাই স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত রাগানুগা ভজন সম্পর্কিত সুস্পষ্ট উপদেশ। যথা—

'বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।।
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের সেবন।।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-মধ্য -২২পঃ)

অর্থাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে এই কৃষ্ণানুরাগী গোপীগণের বিশুদ্ধ ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করে, মায়াতীত নিত্য ধামে মনের দ্বারা তাঁদেরই সান্নিধ্যে সিদ্ধদেহে নিজের অবস্থিতি ভাবনা দ্বারা দিবারাত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সেবা চিন্তন করা, তাকেই গোপী আনুগত্যে রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজন বলে। আর তার বাস্তব রূপরেখা বা পদ্ধতি হোল "শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থে বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা চিন্তন। যার সাধন মনের দ্বারা সিদ্ধদেহে ভাবনা দ্বারাই হতে পারে। তাহলে মনঃশুদ্ধি না হলে, মন সর্ব্বপ্রকার বিষয় মুক্ত না হলে, এ উপাসনা সম্ভবই হতে পারে না।

অতএব স্ত্রী-পুত্রের সান্নিধ্যে বাস করে, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সংগ্রহে রত অবস্থায় যে এই বিশুদ্ধতম পবিত্রতম রাগমার্গের ভজন যথার্থ ভাবে কদাপি সম্ভব নয়, এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট সত্য।

সুতরাং এই উপাসনায় বিষয়-বিতৃষ্ণাপূর্ব্বক বৈরাগ্যের যে কত খানি প্রয়োজন হয়, স্ত্রী-সঙ্গাদি বিষয়ভোগ ও বিষয়-ভোগী বিষয়ীলোকের কাছ থেকে এবং সর্ব্বপ্রকার বিষয় ভোগ থেকে যে কতখানি দূরে থাকতে হয়, এই রহস্যময় বিশুদ্ধতম কৃষ্ণভক্তির যিনি প্রবর্ত্তক, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল উপদেশই দেন নাই, পরন্তু সন্ন্যাস-লীলায় নীলাচলে অবস্থিতিকালে স্বয়ং আচরণ করে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আবার নিজ অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামীপাদগণের দ্বারা বৃন্দাবনে এই ভজনের প্রবর্ত্তন করে আচরণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে জানিয়েছেন।

সুতরাং সুদৃঢ় বৈরাগ্যের উপর আরোহণ করে সম্পূর্ণ ভাবে বিষয়-ভোগ-বাসনা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে, কৃষ্ণ অনুরাগে হৃদয়কে রসায়িত করে কিভাবে রাগমার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করতে হয়, তার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ হলেন শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্‌গোস্বামীপাদ ও তাঁদের অনুগামী বৃন্দাবনবাসী কতিপয় বিরক্ত বৈষ্ণব।

এই রাগানুগামার্গের ভজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় সর্ব্বপ্রথম শ্রীধাম বৃন্দাবনেই আরম্ভ হয়েছিল। শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্ গোস্বামীপাদগণই হলেন- এই ভজনের আদি প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান আচার্য্য। অকৃত্রিম-শুদ্ধ-বৈরাগ্যের উপর নির্ম্মিত, বিষয়-সম্পর্ক-রহিত, পবিত্র হৃদয়ে অনুরাগের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই রহস্যাতিরহস্যময় ভজনের ধারা তাঁদেরই কৃপায় একমাত্র বিরক্ত-বৈষ্ণবগণের মধ্যেই শ্রীধাম বৃন্দাবনে দীর্ঘ্যকাল যাবৎ প্রবাহিত ছিল।

ঐ বিশুদ্ধ-ভজন ধারার অত্যুজ্জ্বল আদর্শই আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ শ্রীমৎ পণ্ডিত বাবার' জীবনে গোস্বামীপাদগণের কৃপায় প্রকাশ পেয়েছিল। আজ থেকে ৭৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অপ্রকট হয়েছেন। এরমধ্যে কালের দুর্বার গতিতে ঐ ভজন-ধারা অনেক পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হতে হতে বর্ত্তমানে তা অনেক বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। তার অন্যতম কারণ এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাভিষিক্ত শ্রীশ্রী রূপ-সনাতন পাদ এই বিশুদ্ধ রাগানুগা-ভজন মার্গের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আচার্য্য। তথাপি তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ না করে কার্য্যতঃ অনেকে পরবর্ত্তী কালে, রচিত গুটিকায় লিখিত ভজন ধারাকেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ রূপে

গ্রহণ করেছেন। ফলে বহুক্ষেত্রেই বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

সম্ভবতঃ গৌর মন্ত্রের প্রবর্ত্তনও ঐখান থেকেই হয়েছে। কারণ শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীব পাদের কোন রচনাতেই গৌর মন্ত্র সম্বন্ধে একটা কথাও তাঁরা কোন গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠাতেই লিখেন নাই এবং উপদেশও দেন নাই। একথা সমস্ত বিদ্বৎ সমাজ অবগত আছেন। তথাপি শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীপাদকে উপেক্ষা করে পরবর্ত্তী কালে রচিত 'গুটিকা' নামক রচনাকেই কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়? তা সুধীগণই জানেন, মাদৃশজীব আমাদের বিচার করার অধিকার নেই।

এখানে আরও বিবেচ্য বিষয় এই যে, গুটিকা প্রকাশক পরম পূজ্যপাদ সিদ্ধবাবা তিনি গৃহত্যাগী আবাল্য ব্রহ্মচারী সর্ব্বপ্রকার বিষয় ভোগ থেকে বিরত মাধুকরী-বৃত্তিধারী মহাবিরক্ত সর্বত্যাগী সিদ্ধ সাধু ছিলেন। আর তিনি যাঁদের গুটিকায় লিখিত ভজন ধারার উপদেশ করেছেন, তাঁরাও সর্ব্বত্যাগী মাধুকরী-বৃত্তিধারী বিরক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

কিন্তু এখন কেহ কেহ মনে করছেন—বৈরাগ্য-রহিত, বিষয় ভোগে লিপ্ত অবস্থাতেও অর্থ সম্পদ-ধন-মান-সম্মান সব কুল বজায় রেখেও এই রাগমার্গের ভজনে কোন ব্যাঘাত হয় না। আবার অনেকে মনে করেন যে স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধব স্বজন, ব্যবসা-বানিজ্য প্রভৃতির মধ্যে অবস্থান করেও রাগমার্গের ভজনের কোন হানি হয় না, রাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণের কোন ব্যাঘাত হয় না, ইত্যাদি এক নবীন রাগমার্গের কথা শোনা যায়। যা এক অদ্ভুত হাস্যস্পদ ব্যাপার। এক কনা কপর্দ্দক বা এক বিন্দু বিষয় ত্যাগ

করব না অথচ রাগমার্গের ভজন করব, এরকম ভাবনাকে অদ্ভুত হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কি কথা বলা যেতে পারে। এটা কোন তর্কের কথা নয়, বিচার-বিবেচনার কথা।

বিষয় ভোগী যাঁরা, তাঁদের আনুগত্য করা বিষয় ভোগের মধ্যে সহজভাবেই হতে পারে। কিন্তু মহাবিরক্ত সর্ব্বত্যাগী শ্রীকৃষ্ণৈকজীবন গোপীগণের এবং শ্রীরূপাদি গোস্বামীপাদগণের আনুগত্য করা, ধন-মান সঞ্চয়ের মধ্যে, বিষয়ভোগের মধ্যে যে, কদাপি সম্ভবই হতে পারে না, এই ধ্রুব সত্য সিদ্ধান্তকে কোন মতেই বিকৃত করা যাবে না, কোন ভাবেই এদিক-ওদিক করে অস্বীকার করাও যাবে না।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ এ সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক-যুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়েছেন।

"ন হি সূর্য্যান্ধকারয়োরৈকাধিকরণ্যং ঘটেতেতি"

(ভাগবত-১১।২০।২৯ সারার্থদর্শিনী)

অর্থাৎ সূর্য্য আর অন্ধকার, এ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু; উভয়ের কখনও একসঙ্গে অবস্থিতি হতে পারে না।" তেমনই বিষয়-ভোগ, আর ভগবদ্ভজন, ধন-সম্পদ-মান-সম্মান সংগ্রহ ও রাগমার্গে রাধাকৃষ্ণের ভজন, এ দুটো কাজ কখনও এক সাথে হতে পারে না। একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জেনে রাখতে হবে যে, গোস্বামীপাদগণের প্রবর্ত্তিত ও আচরিত এবং উপদিষ্ট যে রাগমার্গ, তা সর্ব্বপ্রকার বিষয় সংস্পর্শ থেকে সর্ব্বথা মুক্ত, অতিবিশুদ্ধ হতেও বিশুদ্ধতম, মহাবৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। হয়তো অনেকে এই আলোচনাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু

পণ্ডিত বাবার জীবন-চরিত্রে রাগমার্গের প্রকৃত উপাসনা সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব আছে বলেই সাধক-জগতের দিকে দৃষ্টি রেখে শুদ্ধ ভজন রহস্যটি দুর্গম বলেই, এই বিশুদ্ধ রাগমার্গের প্রকৃত রূপরেখা সম্বন্ধে সামান্য ভাবে লিখিত হল। সমাজের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হল।

এইজন্য এই জীবাধমের ধৃষ্টতাকে করুণাসিন্ধু বৈষ্ণবগণ ক্ষমা করবেন। আমি এখানে যথার্থ সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-প্রমাণ অনুসারে গোস্বামীপাদগণের নির্নীত রাগমার্গ সম্বন্ধে, ভক্ত-সমাজে স্পষ্টীকরণের জন্য যে আলোচনা করেছি, এতে যদি আমার কোন ভুল-ত্রুটি থাকে সমস্ত বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে অবনত মস্তকে শতকোটিবার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এখন মূল প্রসঙ্গে আসা যাক্— শ্রীমৎ পণ্ডিত বাবা বর্ষাণে কোন নির্জন স্থানে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থানুসারে একান্ত ভজনে মনোনিবেশ করলে ভজনে অভিনিবেশের কিছু বাধা উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ ভজনের মার্গ সর্ব্বদা সুগম হয় না, প্রায়ই বিঘ্ন-বহুল হয়ে থাকে। তবে বাধা-বিঘ্নগুলি সাধারণত বোকা নয়, বেশ চতুর। ভক্তির বেশ নিয়ে সাধকের কাছে আসে, তাই সাধক মহাশয় বিঘ্নের চাতুরী সহজে বুঝতে পারেন না। এখানেও পণ্ডিত বাবার সামনে কীর্ত্তনের বেশ ধারণ করে বিঘ্ন উপস্থিত হল।

বর্ষাণে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরচরণ দাস বাবাজী মহারাজের মুখে কীর্ত্তন শুনে কীর্ত্তন শেখার ইচ্ছা হল। এই প্রসঙ্গে দু-একটি কথা জানিয়ে রাখি জয়পুরে শ্রীনৃসিংহ দাসজী ছিলেন সঙ্গীত বিশারদ একথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, পণ্ডিত বাবা পূর্ব্বাশ্রমে থাকা

কালীন কিছুদিন তাঁর কাছে সঙ্গীত চর্চ্চাও করেছিলেন। পূর্ব্বের লোভ বশতঃ বর্ত্তমানে কীর্ত্তন শেখার আগ্রহ হয়, আর কার্য্যতঃ কীর্ত্তন শিক্ষা আরম্ভ করলেন।

বড় দশকুশী তালে একটি গান শিখতে তিন মাস লাগল, এদিকে ভজনের আবেশ কমে গেল, কীর্ত্তনে আবেশ হল। খবর বৃন্দাবনে পৌছল, বড় গুরুভাই শ্রীগৌরশিরোমণি মহোদয় সিদ্ধবাবাকে জানিয়ে বর্ষাণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ দাস বাবাকে (পণ্ডিত বাবাকে) বৃন্দাবনে আনয়ন করলেন। সিদ্ধবাবা তখন উপদেশ দিয়ে কীর্ত্তন বন্ধ করে ভজন করার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। অচিন্ত্য-চিন্তামণিতে শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস বাবা সেই উপদেশের কথা লিখেছেন,— **"শুন বাছা প্রাণধন, ছাড় উপশাখাগণ, গুণ-কলা ভক্তি-বিড়ম্বন।"** আসলে উপশাখাগুলি ভক্তি লতার অঙ্গে যুক্ত থাকায় ভক্তির পরিপন্থী বলে সকল সাধক সহজে বুঝতে পারেন না।

বস্তুতঃ পক্ষে সঙ্গীত বিদ্যা একটি বিচিত্র কলা, জনতা আকর্ষণের এমন দিব্য-মহৌষধি আর নেই। সৃষ্টির ইতিহাসে অদ্বিতীয় বলা চলে। সঙ্গীত কত মহাত্মার বৈরাগ্য-ধর্ম্ম গ্রাস করেছে তার হিসাব নেই। পণ্ডিত বাবার কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতি মোতিদেবীর নাতি পণ্ডিত শ্রীহরিনারায়ণ শর্ম্মাজী মহোদয়ের রচনায় জানা যায় যে, দার্শনিক পণ্ডিত বহুতর গুণের অধিকারী হয়েও সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত শ্রীমৎ নৃসিংহ দাসজী মহারাজকেও গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়েছিল।

কিন্তু ভক্তি মার্গে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন প্রভুর আরাধনা রূপী 'কীর্ত্তন' 'গুণ কলা' নয়। ভগবৎ কীর্ত্তন দিব্য চিন্ময় বস্তু। পরম

পূজ্যপাদ বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীমৎ রাম দাস বাবাজী মহারাজ ভগবন্নাম কীর্ত্তনের কি বিপুল মহিমা তিনি সমগ্র জীবন ব্যাপী কীর্ত্তন করে তা জানিয়ে গিয়েছেন। সে কীর্ত্তন কিন্তু কলা নয়, তা ছিল আর্তি-উৎকন্ঠাময় শুদ্ধ কীর্ত্তন। তিনি কলা একটুও পছন্দ করতেন না। খোল করতাল ব্যতীত কোন আধুনিক বাদ্য যন্ত্র তিনি কীর্ত্তনে ব্যবহার করতে দেন নি। কীর্ত্তনের মধ্যে মহা মহিমা দেদীপ্যমান। কত মানুষকে যে তিনি কাঁদিয়েছেন, তিনি তো কেঁদেছেনই, তাঁর কান্নাই ছিল কীর্ত্তন, সে এক অনুপম বস্তু। পাষণ্ডের পাষণ্ডত্বকে গলিয়ে দিয়েছেন। তা ছিল প্রেমময় কীর্ত্তন। তবে যে সিদ্ধবাবা বললেন- গুণ কলাবিড়ম্বনা, ঠিকই বলেছেন— সঙ্গীত বিদ্যাই গুণ কলা, তা জনতা মুগ্ধকারী, কিন্তু কীর্ত্তন হল দিব্য সাধন। এখানে অনেক সূক্ষ্ম বিচার আছে।

যাই হোক্ ভক্তি জগতে ভক্তির অন্তরায় বহু উপশাখা আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীপাদকে অনেক উপশাখার কথা শুনিয়েছেন, যা ভক্তির প্রবল অন্তরায়।

যথা— **কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।**
ভক্তি, মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।।
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়।।
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য - ১৯ পরিঃ)

যে গুলি নিষিদ্ধ-আচার-উপশাখা, তা আমরা সকলেই বুঝতে পারি, সেটি যাঁর কাছে থাকে তাঁকে বেশ গুছিয়ে নিন্দাও করি। কিন্তু যে উপশাখাগুলি সমাজে লাভ, পূজা-প্রতিষ্ঠা তৈরী করে, সে গুলিও যে নিষিদ্ধাচারের মতই ভক্তি-জগতে প্রবল অন্তরায়, তা আমরা সহজে বুঝতে পারি না।

এইজন্য প্রভু বলেছেন—উপশাখাকে প্রথমেই ছেদন কর, তবে' ভগবৎ প্রাপ্তির আকাঙক্ষা রূপী মূল শাখা' বৃদ্ধি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণচরণে পৌছতে পারবে।

এখানে সিদ্ধবাবা জানালেন যে, গুণ-কলা মাত্রই ভক্তির অন্তরায়। কীর্ত্তনের সাথে কলা মিশ্রিত হলে তা কেবল লোক রঞ্জনেই পর্য্যবসিত হয়, এই কারণে তাঁর শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন শিক্ষাকে 'গুণকলা রূপী উপশাখা বলেছেন, যা শুদ্ধাভক্তির অন্তরায়। তাই কীর্ত্তন শিক্ষা বন্ধ করে ভজন করতে বল্লেন।

সুতরাং গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করে আবার বর্ষাণে গিয়ে একান্ত ভাবে ভজনে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু ভজনে মন বসল না। অনেক কসরৎ করেও কিছু কাজ হল না। মনে খুব অনুতাপ হতে লাগল, অন্ন-জলও ত্যাগ করে কেবলই আক্ষেপ করতে থাকেন, শরীর ক্ষীণ হয়ে গেল, শেষে বৃন্দাবনে শ্রীগুরুপাদ পদ্ম সমীপে উপস্থিত হয়ে সব নিবেদন করলেন।

"দুঃখে আসি গুরুপদে, নিবেদিল মন খেদে,
তিঁহ কহে—কর অনুষ্ঠান।

একান্ত বনেতে বসি, মন্ত্র জপ অহর্নিশি,
শীঘ্র প্রভু হবে কৃপাবান।।"

(অচিন্ত্য চিন্তামণি)

তাহলে এখানে প্রমাণিত হল যে, কীর্ত্তন শিখতে গিয়ে মনের মধ্যে বিক্ষেপ তৈরী হয়ে গেছে, তাই মন ভজনে অভিনিবিষ্ট হচ্ছিল না। এই সূক্ষ্ম বিচার দৃষ্টিতেই গুরুদেব বড়তালের কীর্ত্তন শিক্ষাকে 'গুণ কলা বিড়ম্বনা' বলেছেন।

যাই হোক্ শ্রীগুরুদেব আশ্বাস দিয়ে আদেশ দিলেন,— "ব্রজভূমি সিদ্ধভূমি, একান্ত স্থানে গিয়ে অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্র অহর্নিশি জপ কর, প্রভু অচিরেই তোমাকে কৃপা করবেন।" তখন পণ্ডিত বাবা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে প্রণাম করে নির্জন স্থানের অন্বেষণে শ্রীনন্দগ্রামে পৌঁছলেন। সেখানে উদ্ধব কেয়ারিতে কদম্বতলে বসে একান্তমনে মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

ব্রজধাম চিন্তামণিভূমি, আর এখানে বৃক্ষও কল্পবৃক্ষ। সুতরাং কাকেও নিরাশ করেন না। সতের দিন মন্ত্র জপের পর শ্রীপ্রিয়া-প্রিয়তমের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে অনির্বাচ্য পরমানন্দরসে পরিপ্লুত হলেন। আবার প্রভু বরদানেও মহা কৃপা করলেন। বর চাইতে বল্‌লে—তিনি জানালেন। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় ভজন করছি, কি চাই জানি না, যুগল কিশোরের প্রসন্নতাই চাই; এ ছাড়া আমার আর অন্যকোন বরে প্রয়োজন্ নেই।'

অনির্বাচ্যতম সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের দিব্য-মূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ শ্রীভগবৎ স্বরূপের এটাই স্বাভাবিক গুণ যে, বিশুদ্ধভক্তগণ

শ্রীভগবানের প্রসন্নতা ব্যতীত অন্যকোন বরের কথা ভাবতেই পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্রে এর অজস্র দৃষ্টান্ত আছে।

শ্রীভাগবতে দেখা যায়—মথুরার প্রান্তসীমায় ধবলগিরি পর্ব্বতের গুফার মধ্যে বহুকাল যাবৎ নিদ্রিত ছিলেন মহারাজ মুচকুন্দ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালযবন দ্বারা তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করলে তাঁর দৃষ্টিমাত্রেই কালযবনের নিধন হলে প্রভু মুচকুন্দের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রভুর অলৌকিক-রূপমাধুর্য্যে বিমুগ্ধ মুচকুন্দকে প্রভু বললেন,—'মহারাজ! আপনাকে বরদান করার জন্যই আমি এখানে এসেছি, যে আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করেছে এবং আপনার দৃষ্টিপাতে ভষ্ম হয়েছে, সে ছিল কালযবন।

এখন বলুন আপনি কি বর নেবেন।' মুচকুন্দ সব শুনে সুন্দর ভাবে সংসারের দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রত সমস্ত প্রাণীগণ ও বুদ্ধিমান মনুষ্যগণও কি ভাবে বিষয়-ভোগের দ্বারা দুঃখ-সাগরে পতিত হয়, সে সম্বন্ধে যুক্তি যুক্ত বাক্যে বর্ণনা করে শেষে বললেন, আমাকে সাধুসঙ্গ দিন, আর যা আমার হৃদয়ের প্রার্থনা,—"হে বিভো! আপনি সবই জানেন—আমি 'অকিঞ্চনগণের সর্ব্বোত্তম প্রার্থনীয় আপনার পাদপদ্ম সেবন ব্যতীত অন্যকোন বর প্রার্থনা করি না', যেহেতু কোন্ বিবেকী পুরুষ মুক্তিপ্রদাতা আপনার ভজন করে নিজের বন্ধনের কারণ স্বরূপ অন্যবর কামনা করে?

ভগবান প্রসন্ন হয়ে মুচকুন্দকে তাই দান করেন। অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য বদরিকাশ্রমে তপস্যা করার আদেশ দেন। কোন শুদ্ধভক্তই ভগবানের সেবা ও প্রসন্নতা ছাড়া অন্য কোন বর ইচ্ছাই করেন না। আর ব্রজদেবীগণের আনুগত্য করার জন্য যাঁরা

সর্ব্বত্যাগ করেন, তাঁদের তো ভগবৎ সেবা ব্যতীত অন্য কোন কামনার গন্ধও থাকে না।

এখানে বিশেষ বিবেচ্য এই যে, ব্রজধাম চিন্তামণিময় অপ্রাকৃত দিব্য ভূমি, আর শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র হল নিখিল মন্ত্রগণের রাজা, মন্ত্ররাজ সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ অসমোর্দ্ধ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সিদ্ধ পণ্ডিত বাবার শ্রীরাধা কৃষ্ণের দর্শন ও বর লাভ বিষয়ে সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। যেহেতু অনন্য নিষ্ঠায় সবই সম্ভব হয়ে থাকে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে জানা যায়,—অচিরেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম পাওয়ার জন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রূপগোস্বামীপাদ ও শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীপাদ, দুই ব্রাহ্মণ দ্বারা বিশেষ বিধান অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের দ্বারা দুটি পুরশ্চরণ করিয়েছিলেন। তার ফল অবিলম্বেই লাভ হয়েছিল। অর্থাৎ অচিরেই রাজমন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ পদ্ম দর্শন ও কৃপাভিষেকে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

ভক্তিসন্দর্ভে ১৫৩ অনুচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের বিশেষ মহিমা বর্ণনা দেখা যায়। মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র পরম্পরা প্রাপ্ত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-সদ্গুরু পাদপদ্মের নিকট দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধভাবে যদি প্রতিদিন মাত্র দশবার করে জপ করা যায়, তাহলেও উপস্থিত সমস্ত বিপত্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যদি সহস্র বার জপ করা যায়, মহাপাপ ও মহাবিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, আবার যদি অযুত অর্থাৎ দশ হাজার জপ করা

যায়, তাহলে সর্ব্বপ্রকার মহাপাতক থেকেও অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র যে আশাতীত ভাবে মনো অভিলাষ পুরণ করে, এবিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নেই, দার্শনিক বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব পাদ ভক্তিসন্দর্ভে লিখেছেন—"**তথা মনসোহপ্যগোচরফলদানে শ্রীধ্রুবচরিতং প্রমাণম্। পরমভক্তি সম্বলিত স্বলোক দানাৎ।।**"

(ভক্তিসন্দর্ভ)

অর্থাৎ "শ্রীভগবদ্ভক্তি যে মানস-সংকল্পেরও অগোচর ফল দান করেন, ধ্রুব চরিতই তার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ। ধ্রুবের আশাতীত বস্তু পরমভক্তি সম্বলিত ভগবানের ধ্রুব নামক নিজ লোক ধ্রুবকে ভগবান্ দান করেছিলেন।"

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ দ্বারা আশু সিদ্ধি লাভ হয় এবিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নেই এবং সর্ব্বপ্রকার মনো অভিলাষ আশাতীত ভাবে পূর্ণ হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য মুকুটমণি শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীপাদের বিশ্ববিখ্যাত অদ্বিতীয় রচনা 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের' দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনায় গোপ কুমার উপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের অসমোর্দ্ধ্ব মহিমা দেখানো হয়েছে। তত্তদ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। গোপাল তাপনী উপনিষদে ও ব্রহ্মসংহিতা শাস্ত্রে কৃষ্ণমন্ত্র সম্পর্কে বিশেষ মহিমা বলা আছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বাতারগণের ও প্রাকৃত-অপ্রাকৃত জগতের সর্ব্বকারণেরও কারণ, অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণতম অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তাঁর মন্ত্রও শ্রীকৃষ্ণের মতই মহাশক্তিশালী অত্যাশ্চর্য্য মহিমায় দেদীপ্যমান।

যথা— **মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাৎ ভগবতো হরেঃ।**
সর্ব্বাবতারবীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যমত্তমাঃ।।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১/ বি)

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্ব্ব অবতারের বীজ স্বরূপ, আবার সর্ব্বকারণেরও কারণ, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র সমূহ সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষা অধিকতম অচিন্ত্য প্রভাব শালী।

সুতরাং এই মন্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ও আদেশে যথার্থ ভাবে পুরশ্চরণ করে আশারও অতীত বস্তু লাভ হতে পারে এতে আর সংশয় কোথায়।

কিন্তু বর্ত্তমানে যে তার ফল পূর্ণ রূপে দেখা যায় না কেন? উত্তর শাস্ত্রে দিয়ে রেখেছে—"**সন্দিগ্ধো হি হতো মন্ত্রঃ ব্যগ্রচিত্তঃ হতো জপঃ।**" অর্থাৎ মন্ত্রের মধ্যে অচিন্ত্য-মহিমা থাকলেও যাঁরা মন্ত্রের মহিমাকে সন্দেহ করে বা যথার্থভাবে বিশ্বাস করে না এবং মনও ব্যাকুল ও চঞ্চল, সেক্ষেত্রে মন্ত্র জপ ব্যর্থ হয়ে থাকে। পদ্মপুরাণ-বাক্যে তা স্পষ্ট বলা আছে। অতএব বিশ্বাসী সাধক সর্ব্বকালেই মহাফল লাভ করতে পারেন, এবিষয়ে অনুমাত্রও কোন সন্দেহ নেই।

এখানে ব্রজের মহিমা তো অতিবিলক্ষণ, আর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ঐশ্বর্য্যে-সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে-কারুণ্যে সর্ব্বোপরি ভূমিতে বিরাজিত। এখানে পণ্ডিত বাবা ছিলেন সর্ব্বপ্রকারে বিশুদ্ধ হৃদয়, বিষয় সম্পর্ক রহিত নির্মল চিত্ত, তাই সিদ্ধ ব্রজভূমিতে এই প্রকার কৃপা লাভ অসম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে আদেশ করলেন— 'বৎস! রাঘবের গোফায় গিয়া ভজন কর' এইভাবে সাক্ষাৎ দর্শনজ

ও বাচজ কৃপা করে শ্রীপ্রিয়া-প্রিতয়তম অন্তর্ধান করলেন। পণ্ডিতবাবা কৃপালাভে মহাধন্য হয়ে তখন হিংস্র জন্তু-সঙ্কুল রাঘবের গোফায় গমন করে তীব্র ভজনে প্রবৃত্ত হলেন। ভজনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, দেহ-দৈহিক অনুসন্ধান প্রায় ছিল না বললেই চলে। এইভাবে ছয় বৎসর অতিবাহিত হল। এই সময়ে তিনি দু-তিন দিন পরে পরে গোফা থেকে বার হতেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিশেষ কোন অনুভব হত না। এটা কোন অসম্ভব নয়। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীপাদ "শ্রীকৃষ্ণভক্তিকে অলৌকিক দিব্য-সুধা বলেছেন। যিনি তা পান করেন, তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো দূরের কথা, দেহ-দৈহিক-স্মৃতি পর্য্যন্ত থাকে না। তখন পাঞ্চভৌতিক জড়দেহটাও চিন্ময় হয়ে যায়।"

কৃষ্ণভক্তি সুধা পানাৎ দেহ-দৈহিক বিস্মৃতে।
তেষাং ভৌতিক দেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা।।

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১/৩/৬১)

শ্রীমৎ সনাতন পাদ শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণভজনের আনন্দকে অনির্বাচ্য ব্রহ্মানন্দ থেকেও অধিক অনির্বাচ্যতর আনন্দ বলেছেন। সুতরাং পণ্ডিত বাবার জীবনে তা বাস্তবে অনুভূত হয়েছিল। বৈরাগ্যই হল এই ভজনের প্রথম সোপান। তারপর চাই ভগবানে অনন্যশরণাগতি। ভক্ত, ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রতিপাদক ভজন সিদ্ধান্ত-প্রধান গ্রন্থ হল শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অধ্যায়গুলির নাম যথাক্রমে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভজন, বৈকুণ্ঠ, প্রেম, ইত্যাদি। এখানে বোঝার বিষয় এই যে, বৈরাগ্য ও জ্ঞান লাভের পরই বিশুদ্ধ ভজন হয়; বর্ত্তমানে বিষয়-সম্পর্ক-রহিত

বিশুদ্ধ বৈরাগ্য নামক সাধনটিকে দূর থেকেই বিদায় দিয়ে বসে আছি। তার জায়গায় ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানকে স্থাপন করে মাদৃশ জীব বিশুদ্ধ রাগমার্গের ভজন করতে চাইছি ও বিশুদ্ধ ভজনের কথা বলছি। তার ফল এই হচ্ছে যে, যে অনর্থের জায়গায় বসে আছি সেটাইতো নিবৃত্তি হচ্ছে না, আর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেম প্রভৃতি যা কিছু উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানের কথা শাস্ত্রে বলা আছে, সে তো কেবল আলোচনাতেই রয়ে যাচ্ছে, জীবনে তার পরশ হচ্ছে কোথায়?

কারণ, শাস্ত্র বলেছেন—"**মায়াতীত হইলে হয় আমার অনুভব**। (চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ) 'কিন্তু মাদৃশ জীব তিল পরিমান মায়িক বস্তু ত্যাগ করতে রাজী নয়, পরন্তু মায়িক-বস্তু সংগ্রহ করার কার্য্য থেকেও বিরত হওয়ার কোন চেষ্টা নেই, বিপরীত ভাবে মায়িক জগতে নিজের প্রতিপত্তি বিস্তারের সমস্ত কৌশলই বলবৎ আছে। অথচ সর্ব্বত্যাগী ব্রজদেবীগণ ও সর্ব্বত্যাগী ষড়্গোস্বামীপাদগণের কথা বলছি। এমন অবস্থায় যা হওয়ার তাই হচ্ছে, বিষয়-সম্পদ আর মান-সম্মান এগুলিই বেড়ে চলেছে। কিন্তু এটাতো জীবনের সাফল্য নয়, এতো উপশাখারই বৃদ্ধি হচ্ছে, যা ভক্তি জগতের মহান্ অন্তরায়। বস্তুতঃ পক্ষে সাধক-জীবনের সাফল্য শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করা।

প্রভু বললেন—"**প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।**"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য-২০ পরিঃ)

জাগতিক-বৈভব যতই রাশিকৃত হোক্, বিশ-পঞ্চাশটি মঠ-মন্দির বা বিশ-পঞ্চাশ হাজার শিষ্য-সেবক যতই নির্মিত ও সংগৃহীত হয়ে

থাক্, কিন্তু মনে রাখতে হবে 'ভগবানে প্রেমভক্তি' না হলে অর্থাৎ জীবনে প্রেমের পরশ না হলে, সে জীবন ব্যর্থ-জীবন, দরিদ্র-জীবন। যেহেতু কৃষ্ণপ্রেমই হল যথার্থ সম্পত্তি। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবিসংবাদিত সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত। আর সাধক-জীবনেরও তাই চরম সাফল্য। ভগবৎ সাক্ষাৎকার এক ক্ষণমাত্রও যদি জীবনে লাভ হয় তাহলে কোটি চিন্তামণি লাভও তার সমান হয় না। রাজা প্রতাপরুদ্র বলেছিলেন—

এক ক্ষণ যদি পাই প্রভুর দরশন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৯ পরিঃ)

শ্রীভগবানের স্বরূপ অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যামৃতের মহাসিন্ধু। যদি কারও ভাগ্যে এক কণারও স্পর্শ হয় তাহলে তখন তাঁর জীবনে যে মহাবৈরাগ্য স্বাভাবিক হয়ে যায়, একথা শাস্ত্রে বহুশঃ বর্ণনা দেখা যায়।

"কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
অন্যত্র তার কভু নাহি রহে রাগ।।" (আদি ৭পরিঃ)
কৃষ্ণপাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়।। (অন্ত্য ৬ পরিঃ)

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ইত্যাদি অনেক সিদ্ধান্ত আছে। সুতরাং পণ্ডিত বাবা দর্শনানন্দে বিভোর হয়ে থাকায় এখন থেকে তাঁর বৈরাগ্যও আরও তীব্র হয়ে উঠল। গোস্বামীপাদগণের কৃপায় কিনা হতে পারে? পণ্ডিত বাবার বৈরাগ্য সম্বন্ধে তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীকৃপাসিন্ধু

দাসজী মহারাজ 'অচিন্ত্য-চিন্তামণি'তে লিখেছেন,—

"আরে মোর বড় বাবা গুণের নিধান।

ছেঁড়া কান্থা করোয়া হাতে, ছিন্ন কৌপীন চীর মাথে,

অনুরাগে অরুণ নয়ান।

দিবানিশি নাহি জ্ঞান, নাহি বাধে অন্নপান,

লীলারসে সদারহে ভোর।।

গ্রাম্য বার্ত্তা-চর্চা ভয়ে, জনসঙ্গ ছাড়ি রহে,

কৃষ্ণ কৃপায় বৈরাগ্য কঠোর।।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য মুকুটমণি শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীপাদের চরিত্র বর্ণনে শ্রীমৎ কবি কর্ণপুর পাদ লিখেছেন,—

"অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যে অবধূতাকৃতিঃ।

শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসরো ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্।"

অর্থাৎ "গোস্বামীপাদের অন্তরটি ছিল ভগবদ্ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হৃদয়, কিন্তু তা বোঝার উপায় ছিল না, কারণ, বাহিরে ছিল অবধূতের বেশ। ঠিক যেমন শ্যাওলা আচ্ছাদিত এক অতি গভীর বিশাল সরোবর। কিন্তু ভক্তিতত্ত্ববিদ্ রসিকগণ জানতেন গোস্বামীপাদের অলৌকিক মহিমার সংবাদ।'

"ছেড়া কাঁথা নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণ গাথা।' এমন বেশ, আর ভাব দেখলে সাধারণ মানুষ পাগল ব্যতীত কি মহাসিদ্ধ সাধু মনে করতে পারেন? বিশেষ করে কলিকালে বৈভব প্রাচুর্য্যের যুগে? নিত্যসিদ্ধ পরিকর যাঁরা, তাঁদের তো সবই অলৌকিক হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের কৃপা-দৃষ্টি যে মহাভাগ্যবানের উপর পড়ে,

তাঁরও জীবন পরশমণির পরশে লোহা সোনা হয়ে যাওয়ার মত অলৌকিক বৈরাগ্যের প্রকাশে মহীয়ান্ হয়ে ওঠে এবং ভাগবত রসের আস্বাদনে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

পণ্ডিত বাবা গ্রাম্যবার্ত্তা শ্রবণের ভয়ে সর্ব্বদা একাকী বিচরণ করতেন। সর্ব্বপ্রকার সঙ্গমুক্ত হয়ে একাকী গোফার মধ্যে ভজনানন্দে মত্ত থাকতেন। মস্তকে ছিন্ন বস্ত্র, পরিধানে জীর্ণবস্ত্রের ছিন্নকৌপীন, গলে থাকত ছিন্নবস্ত্র নির্মিত জীর্ণ কাঁথা, হাতে থাকত মাটির করোয়া জলপাত্র।

বস্তুতঃ পক্ষে এক অদ্ভুত-বৈরাগ্যের আদর্শ তিনি ব্রজভূমিতে বিরক্ত-বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলছি—

এই দিন সঙ্কলয়িতা প্রাচীন মদন মোহন মন্দিরে মদন মোহনের সেবায় এবং পরমারাধ্য পরমপূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীচরণ সান্নিধ্যে সেবারত অবস্থায় থাকাকালে সেই সময়ে বিনোদবাণী গৌড়ীয়মঠ' থেকে শ্রীমৎ মদন গোপাল ব্রহ্মচারী নামক এক বিদ্বান সাধু, মহারাজের সাথে সৎসঙ্গ করার জন্য প্রায়ই আসতেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন পরমপূজ্যপাদ মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন,—"রাগমার্গের ভজনের মূর্ত্তিমান আদর্শ ষড়্গোস্বামীপাদগণের অলৌকিক বৈরাগ্য-জীবনের কথা আমরা গ্রন্থেই পড়েছি, তাঁদের দর্শন পাইনি, কিন্তু পণ্ডিত বাবার বৈরাগ্যময় আদর্শ যা দেখেছি, ওনাকে দর্শন করলে গোস্বামীপাদগণের কথা স্মরণ করিয়ে দিত।"

মহারাজ বলতে চেয়েছিলেন যে, বৈরাগ্যের কথা আলোচনা করা হয় বটে, কিন্তু সে বৈরাগ্য কোথায়? পণ্ডিত বাবার জীবনে যে বৈরাগ্য দেখেছি, তা গোস্বামীপাদগণের স্মৃতির উদ্দীপক ছিল। যাই হোক্ পণ্ডিত বাবা সর্ব্বপ্রকার জন-সম্পর্ক-মুক্ত, একাকী গোফার মধ্যে লীলারস-মাধুর্য্যের আস্বাদনে এমনই বিভোর থাকতেন যে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অন্ন-পানের কোন— অনুসন্ধানই থাকত না। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত এক অতর্ক্য অলৌকিক-আনন্দ চমৎকারিতাপূর্ণ দিব্য-মহারসায়ন। এ বস্তুর এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, যিনি ইহা মানস ভাবনা দ্বারা পান করেন, তাঁর হৃদয় দিব্য আনন্দ প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, অন্ন-পানাদি ব্যতীতও দেহের কোন ক্ষীণতা আসে না, পরন্তু দেহ-মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত হৃদয়ের পুষ্টি বর্দ্ধিত হতে থাকে।

শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বর্ণনা দেখা যায়।

যথা— **যৎপীতং শ্রুতিবাঙ্‌মনোভিরনিশং তৃষ্ণাপ্রদং ত্বদ্ভুতং**
সংসারামহার্য্যপি প্রণয়জোন্মাদান্ধ্যমোহাদিকৃৎ।
শশ্বচ্চর্বিতমেব ভুরি রসদং দেহাদি হৃৎপুষ্টিদং
তজ্জীয়াদমৃত-স্পহাহরমিদং "গোবিন্দলীলামৃতম্"।।

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্-১।৫)

অর্থাৎ যা শ্রুতি, মনঃ ও বাক্যের দ্বারা পান করলে তৃষ্ণা নিরন্তর বৃদ্ধি হতে থাকে, যা ভবরোগ শান্তির মহা-মহৌষধ হয়েও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমজনিত মত্ততা, অন্ধতা ও মোহ প্রভৃতি উৎপাদন করে,

যা বারম্বার চর্ব্বিত হলেও অশেষ রস বিশেষ ভাবে প্রদান করে, যা দেহাদি হৃদয়ের পুষ্টিতা দান করে, যা স্বর্গের অমৃত এবং মোক্ষামৃতেরও স্পৃহা হরণ করে, সেই অতি অদ্ভুত মহাশ্চর্য্যেরও মহাশ্চর্য্য স্বরূপ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত সর্ব্বোৎকর্ষের সাথে জয়যুক্ত হোন্।"

এই শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতের এমনই বিপুল আকর্ষণ যে, অপ্রাকৃত অনির্বাচ্য-ব্রহ্মানন্দ থেকেও ব্রহ্মানন্দ-সেবী সাধকের মনকে আকর্ষণ করে। সর্ব্ব প্রকার বন্ধন মুক্ত জ্ঞানী আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের এমনই মহিমা গুণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আত্মারামাশ্চ মনুয়ঃ' প্রভৃতি শ্লোকে তার প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে অতি স্পষ্ট বর্ণনা দেখা যায়—

"ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া তারে করে বশ।।
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণ-গুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।।
"সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব বিস্মরণ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭ পরিঃ)

এইসব উক্তিগুলি ধ্রুব সত্য বলেই জানতে হবে। কিন্তু সুদৃঢ় বিশ্বাস, আর সুদৃঢ় বৈরাগ্যের অভাবের কারণে ঐ অচিন্ত্য অলৌকিক রস-মাধুর্য্য সিন্ধুর কণারও পরশ মাদৃশ জীবের বাস্তব

জীবনে ঘটে না। আজ যান্ত্রিক-সভ্যতার যুগে, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা বড় বড় ধর্ম্ম-সভার অনুষ্ঠান করি, বিশাল বিশাল মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করি, বিপুল সমারোহে মহা আড়ম্বরের সাথে বড় বড় মহোৎসব করি, আর কয়েকটা নিয়ম শিক্ষা করে তাকে পালন করাকেই উচ্চকোটির ভজন বলে মনে করি এবং নিজেকেও মহাধার্মিক বলে মনে করি। কিন্তু যে বৈরাগ্যের উপর, যে আর্ত্তি উৎকন্ঠাময় লালসার উপর বিশুদ্ধ-ভগবদ্ভজনের পথ নির্মিত হয়েছে, যে সর্বত্যাগের উপর শ্রীকৃষ্ণ লীলারসামৃত পানের প্রণালী প্রদর্শিত ও উপদিষ্ট হয়েছে, যা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপাদি ষড়্গোস্বামীপাদগণ এবং পরবর্ত্তীকালের তদনুসারী মহাজনগণ প্রত্যক্ষ-জীবনে বৈরাগ্যের আচরণ করে চাক্ষুষভাবে দেখিয়ে গেছেন, কিন্তু মাদৃশ জীব অতি সুকৌশলে সেই বৈরাগ্যের ও সর্ব্বত্যাগের পথটি আড়াল করে, আলোচনা থেকেও দূরে সরিয়ে রেখে অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মানের ভিতরে বসেই শ্রীকৃষ্ণলীলারস পান করতে চাইছি এবং অপরকেও বলছি। সুতরাং সেই অমৃতের পরশ পাওয়া কেবল কথাতেই থেকে যায়, বাস্তব-জীবনে আর তার ছোঁয়া লাগে না।

পণ্ডিত বাবার আদর্শ, আজকের দিনে এক উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ। এই আলোর সাহায্যে আমরা ভজনের অনেক উপাদানই স্পষ্ট দেখতে পাব, বিষয়-সম্পদ, মান-সম্মান, পূজা-প্রতিষ্ঠা ও অর্থাদি লাভের দুরভিসন্ধি থাকতে যে, জীবনে ভগবল্লীলারসের অনুভূতি একেবারেই সম্ভব নয়, অন্ততঃ এই বোধটুকু হৃদয়ে প্রকাশ হতে পারে, একথা জীবনে অনুভব করাও

কম লাভ নয়। যাই হোক্, পণ্ডিত বাবার এই ভাবে ছয়বর্ষ কাল তীব্র ভজনানন্দের মধ্যে অতিবাহিত হল। এই সময় শ্রীগোবিন্দলীলামৃত রসের আস্বাদনে বিভোর হয়ে থাকায় দেহ-দৈহিক স্মৃতি ছিল না বল্‌লেই চলে। এই সময়ে দুই-তিন দিন বাদে বাদে গোফা থেকে বের হতেন।

এমনই সময়ে একদিন জননী শ্রীমতী কমলা দেবী, কন্যা শ্রীমতি মোতিদেবীকে সাথে নিয়ে পুত্রের সাথে সাক্ষাৎকারের আশায় জয়পুর থেকে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। বৈষ্ণবের মুখে খবর পেয়ে অনুসন্ধান করতে করতে গোবর্দ্ধনে রাঘবের গোফাদ্বারে পুত্র দর্শনের আশায় বসে রইলেন।

তিন দিন বাদ পণ্ডিত বাবা বের হলেন বটে কিন্তু অনুসন্ধান-শূন্য হয়ে তিনি বনের দিকে চলে গেলেন। মাটীর করোয়া হাতে, জীর্ণবস্ত্রের কৌপীন, মস্তকে জীর্ণ বস্ত্র ধারণ করেছিলেন, টাট্ গুদড়ী ধারণ করা অবস্থায় পুত্রকে দেখে জননী প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। পুত্রের নাম ধরে আহ্বান করতে করতে মা পশ্চাদনুসরণ করে ডেকেও কোন সাড়া পেলেন না। অবশেষে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রোদন করতে করতে অগত্যা জয়পুরে ফিরে গেলেন।

এদিকে মাতৃদেবী জয়পুরে গমন করার পরই পণ্ডিত বাবার হৃদয়ে দিব্য-লীলা স্ফুরণ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মন অত্যন্ত বিষন্ন, বহুচেষ্টা করেও স্মরণে মনের অভিনিবেশ আসছে না। শতবার প্রয়াস করেও মনকে স্মরণে বসাতে পারছেন না। প্রাচীন-

বৈষ্ণবের নিকট মানসিক অশান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা জানালেন আপনার মাতৃদেবীর কাছে নিশ্চয় অপরাধ হয়েছে। আপনি তাঁর সাথে কোন বাক্যালাপ না করায় তিনি দুঃখিত হয়ে রোরুদ্যমান অবস্থায় জয়পুরে ফিরে গেছেন।

সুতরাং গর্ভধারিণী জননীদেবীকে সন্তোষ না করলে ভজনে কিছুতেই মন বসবে না। তখন জয়পুরে পত্র লিখে মাকে আনয়ন করেন, মাতৃদেবীর ইচ্ছানুসারে পুছরিতে এক যজমান গৃহে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করলেন। জননী সেবার জন্য ভগবদ্ভজনে তীব্রতা অনেকটাই কমে গেল বটে, কিন্তু অন্তঃসলিলা স্রোতের ন্যায় অন্তরে ভজন-স্রোতের প্রবাহ রুদ্ধ হল না।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আর মহতের চরিতে দেখা যায়, যাঁরা আন্তরীক ভাবে কৃষ্ণোন্মুখ হয়ে থাকেন, তাঁদের জীবনে বাধা-বিঘ্নগুলি বেশীক্ষণ স্থিতি লাভ করতে পারে না। ঐকান্তিক ভজন-নিষ্ঠার প্রবল স্রোতে বিঘ্নগুলি খড়-কুটার মত ভেসে যায়। ঠিক বিপরীত ভাবে এটাও দেখা যায় যে, অন্তরে কৃষ্ণবহির্মুখতা বিদ্যমান থাকতে বাইরে নিয়ম নিষ্ঠা কিম্বা বাহ্যিক-আচারের কঠোরতা দ্বারা অনর্থই দূরীভূত হয় না। এই কারণে প্রভু বলেছেন,—

"কৃষ্ণবহির্মুখ দোষে মায়া ইহতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হইতে মায়া মুক্ত হয়।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪ পরিঃ)

"কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃশৌচাদয়স্তথা।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৬১)

অর্থাৎ যিনি আন্তরীক ভাবেই অন্তরে কৃষ্ণোন্মুখ হতে পারেন, মানে বাস্তবিক ভাবেই যিনি ভগবান ব্যতীত আর কিছুমাত্র অন্যকোন বিষয় কামনা করেন না, এই রকম কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তের কাছে সংযমাদি যাবতীয় মহদ্ গুণরাজী তাঁর কাছে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে থাকেন, এবং মায়াও তাঁর কাছে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না।

সুতরাং পণ্ডিত বাবার জীবনেও তাই হল, হঠাৎ ঐ সময়ে উৎকল থেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক অনুরাগে ভজন লালসা নিয়ে রাঘবের গোফায় পণ্ডিত বাবার নিকট উপস্থিত হলেন। বিরক্ত বা গৃহস্থ কোন ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বাবা জীবনে কখনও শিষ্য করেন না। এই কারণে যুবকের অনুরাগ দেখে ভাদাবলীর মহারাজ শ্রীপ্রভু দাসজী মহারাজের নিকট তাঁর দীক্ষা ও বেশ সংস্কার করিয়ে নিজের কাছে রেখে ভজন শিক্ষা দিতে লাগলেন। তখন থেকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসজীকে নিজ-মাতৃসেবায় নিয়োগ করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ভজনে মনোযোগ দেবার সুযোগ পেলেন।

প্রায় সাত-আট বৎসর কাল ব্রজবাস করে পুত্রের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীমতী কমলা দেবী একদিন মহান পুত্রের কর-কমলের পবিত্র পরশে ধন্য হয়ে ব্রজরজ প্রাপ্ত হলেন। পণ্ডিত বাবার মত মহান্ সিদ্ধ পুরুষের যিনি জননী, তাঁর সিদ্ধি লাভে ব্রজধাম প্রাপ্তিতে আর সংশয় কোথায়। মাতৃদেবীর রজঃ প্রাপ্তির পর পুনরায় পণ্ডিত বাবা পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গমুক্ত হয়ে দৃঢ়তার সাথে অনন্য ভজনে প্রবৃত্ত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসজী কয়েক বৎসরের মধ্যেই পণ্ডিত বাবার কৃপায় ভাবসিদ্ধি লাভ করেন। পুছরীর শ্রীমাধব দাসজী মহারাজ ইঁহারই শিষ্য হয়ে পণ্ডিত বাবার সঙ্গ-সান্নিধ্য লাভে অতিশয় রূপে কৃত্য-কৃত্য হয়েছিলেন।

এরপর কিছুকাল গত হলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র নিয়ে বেশ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই মন্ত্রের স্বপক্ষে কাকাগুরু গুটিকাওয়ালা শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা, শ্রীরাধারমণ-সেবায়েত শ্রীগোপীলাল গোস্বামী প্রভৃতি এবং বিপক্ষে অর্থাৎ শ্রীগৌর-মন্ত্রের বিপক্ষে এবং শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের পক্ষে জেঠাগুরু সিদ্ধবলরাম দাস বাবাজী মহারাজ, বিদ্যাগুরু শ্রীনীলমণি গোস্বামীজী, তৎকালীন শ্রীরাধাকুণ্ডের মহান্ত নৈয়ায়িক শ্রীজগদানন্দ দাসজী পণ্ডিত প্রভৃতি।

দুই পক্ষেই গুরু থাকায় ইনি মহা সমস্যায় পড়েন। যদিও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও বিজ্ঞের অনুভব অকাট্য প্রমাণ হলেও সবাদী-সম্মত নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে জগতের কয়জন বিচক্ষণ মানুষ ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করেন? তাছাড়া শ্রীভগবানের স্বরূপ অখণ্ড অদ্বিতীয় তত্ত্ব হলেও তিনি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি। তাই সকল ভক্তের ভক্তি অনুসারে রুচির ও ভাবের অনুরূপ রূপ প্রকাশ করেন। সুতরাং সমস্যার সমাধান হওয়া এক কঠিন ব্যাপার হয়। তার উপর গুরুবর্গের মধ্যে বাদ-বিবাদে অংশ নিলে কোন না কোন স্থানে অপরাধেরও প্রবল সম্ভাবনা হয়ে থাকে। এখানে বিবেচ্য যে, পণ্ডিত বাবার অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর ভজন প্রভাবের সংবাদ ব্রজ মণ্ডলে বৈষ্ণব-সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং বিচার সভায় তাঁর

ডাক পড়তে পারে, এই সব চিন্তা করে পণ্ডিত বাবা গোফা থেকে পলায়ন করে বর্ষাণে গোপনে ময়ুর কুটিতে বাস করেন। শ্রীরাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের ভাগবত পরমহংস শ্রীপ্রিয়াদাসজী এবং নৈয়ায়িক পণ্ডিত আমোলক রাম শাস্ত্রীজীর গুরুদেব শ্রীস্বামীচরণ সবার সঙ্গে তিনি সেখানে গোপনে প্রায় আট বৎসর অতিবাহিত করলেন। বিবাদ মিটে গেলে পুনরায় ঐ রাঘবের গোফায় এসে প্রায় দশবৎসর যাবৎ মনোনিবেশ সহকারে ভজন করেন।

মন্ত্র বিচারের এই বিবাদ তখনের মত মিটে গেলেও কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌর মন্ত্রের বাদ-বিবাদ আজও মেটে নাই, তা অন্তস্থলে রয়েই গেছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতাদর্শকে তাঁরই নির্দ্দেশে যে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি ষড়্গোস্বামীপাদগণ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রমাণ অনুসারে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রাগানুগামার্গের ভজনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং শ্রীচৈতন্য মনো অভীষ্ট সংস্থাপক রূপে সুবিখ্যাত শ্রীরূপ-গোস্বামীপাদ, কিম্বা প্রভুর উপদিষ্ট ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণতত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষতার সাথে বিচার প্রদর্শন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদ, তথা প্রভুর হার্দ্দ শ্রীভাগবত-তত্ত্ব রসের দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাতা দার্শনিক আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীপাদ এই তিন প্রধান আচার্য্যপাদ, তাঁদের কোন গ্রন্থের মধ্যেই কোন প্রকরণেই বা কোন প্রসঙ্গের মধ্যে কোথাও স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীমহাপ্রভুর মন্ত্র সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই, ও গৌরমন্ত্র সম্বন্ধে একটি বিধানও কোথায় দেন নাই। অথচ তাঁরাই হলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর ও প্রভুর তত্ত্ববেত্তা এক কথায় বলা যায়- শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব এই প্রধান গোস্বামী পাদ ত্রয়ই

হলেন প্রভুর উদ্দিষ্ট রাগানুগাভক্তি মার্গের প্রতিষ্ঠাতা ও এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য।

প্রভু যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ, রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণই, শ্রীকৃষ্ণের কোন অবতার নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, এই সিদ্ধান্তকে তাঁরাই জগতে প্রচার করেছেন এবং শাস্ত্র প্রমাণ ও মহানুভবগণের অনুভব দ্বারাও সুদৃঢ় ভাবে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁরা কেহ তাঁদের কোন রচনাতেই এমন কি একটা পৃষ্ঠাতেও গৌর-মন্ত্রের কোন আলোচনা বা কোন উল্লেখও করেন নাই, আর গৌর-মন্ত্র গ্রহণের তো নাম গন্ধও নেই। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণই রাধাভাব হৃদয়ে ধারণ করে নিজেরই অনন্ত অসীম মাধুর্য্যরস আস্বাদন করেছেন, এই সিদ্ধান্তই তাঁরা বিভিন্ন প্রকরণে জানিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদনই হল শ্রীকৃষ্ণের গৌর-লীলা। গৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে কোন ভিন্ন স্বরূপই ভাবতেন না। অতএব একই স্বরূপের ভিন্ন মন্ত্রে পৃথক উপাসনার ভাবনার অবসর কোথায়?

সুতরাং শ্রীগৌর মন্ত্র দ্বারা পৃথক ভাবে উপাসনার মতবাদ যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরূপ শ্রীসনাতনাদি ষড়্গোস্বামীপাদগণের উপদিষ্ট ভজন ধারা থেকে ভিন্ন কোন কোন ভক্তের নিজস্ব মতবাদ, এ বিষয়ে কোন তর্কের অবসরই নেই। তবে বিভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা থাকতেই পারে, এটা কোন শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়। যেহেতু ভগবান হলেন "অখিলরসামৃত মূর্ত্তিঃ"। কিন্তু উক্ত মতবাদ যে ষড় গোস্বামীপাদগণের উপদিষ্ঠ নয়, একথা সর্ব্বথা নিঃসন্দেহ ভাবে সত্য।

তাছাড়া যে স্বরূপ দামোদর কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ ও তাঁর তত্ত্বের প্রচার হয়েছে, সেই স্বরূপ দামোদর, শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীদাস রঘুনাথ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি প্রমুখ শ্রীধামবৃন্দাবন বাসী গোস্বামীপাদগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ রূপেই অনুভব করেছেন এবং তাঁদের গ্রন্থাদিতেও তাই বর্ণনা করেছেন, তারই সার নির্য্যাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞী ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।"

(আদি-৪র্থ পঃ)

অবার- "চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে।।"

(আদি-২য় পঃ)

"চৈতন্য গোঁসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।"

(চৈঃ চঃ আদি ২ পরিঃ)

সুতরাং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রাধাভাব ভাবিত হৃদয় শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে আবির্ভূত, এই সুদৃঢ় সিদ্ধান্তই তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে, তাঁদের অন্তঃকরণের কোণে কোণে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেহেতু একই স্বরূপ, একই তত্ত্ব এবং একই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের দুই লীলা বা দুই লীলাই এক শ্রীকৃষ্ণেরই

লীলা। সেখানে পৃথক ভাবে পৃথক্ মন্ত্রে পৃথক্ উপাসনার প্রশ্নই তাঁদের মধ্যে ছিল না। তবে যে মহাজনের যে রূপের প্রতি আকর্ষণ, যে ভক্তের যে মন্ত্রের প্রতি প্রীতি তিনি সেই মন্ত্রের প্রতিই অধিকতর রূপে নিষ্ঠা প্রদর্শন করবেন, এতে লেশ মাত্রও কোন হানি নেই, পরন্তু ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শ্রীমৎ কবিরাজ পাদ এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

" শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য সেবন।।
পণ্ডিত গোসাঞি আদি যাঁর যেই রস।
সেই সেই রসে প্রভু হন তাঁর বশ।।
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য-চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ।।
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয়।।

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ)

সুতরাং কবিরাজের কলমে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে, শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপই এক অতর্ক্য, অচিন্ত্যতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয়েও আবার নিজেকে গোপীরূপেও প্রদর্শন করেন। এটা মানব-বুদ্ধির অগম্য দুস্তর্ক্য তত্ত্ব। অতএব যে রূপে যাঁর মন মজবে তিনি সেই রূপেই মনকে মজাবেন, ডোবাবেন এতে কোন রকম ভিন্ন ভিন্ন বিচার বা তর্কের কোন স্থানই এখানে নেই। সুতরাং যাঁর কৃষ্ণ মন্ত্রে গৌর-উপাসনায় নিষ্ঠা, কিম্বা যাঁর গৌরমন্ত্রে গৌর

উপাসনায় নিষ্ঠা, তিনি সেই নিষ্ঠাতেই কৃপা লাভ করবেন। দরকার কেবল নিষ্ঠার দৃঢ়তা। বিষয়-নিষ্ঠাকে বর্জন করে নিজ ইষ্টে নিষ্ঠা রাখাই কল্যানকর পথ। কারণ শ্রীশ্যামসুন্দরই শ্রীগৌরসুন্দর, অথবা শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীশ্যামসুন্দর, আপনি যাঁর প্রতিই আকৃষ্ট হোন, তাতেই আপনার জীবন ধন্য হবে, কিন্তু তর্ক দ্বারা জীবন ধন্য হবে না জীবন কলুষিত হবে মাত্র।

তবে যাঁরা বলেন শ্রীগৌরমন্ত্র ব্যতীত কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হবে না, তিনি খুশীমত বলতে পারেন বটে, তবে কিন্তু এটা তাঁর নিজের ব্যক্তিগত মত মাত্র, কদাপি শ্রীরূপাদি ষড় গোস্বামীপাদগণের মত নয়। ইহা পরবর্ত্তীকালে প্রচারিত মত, ষড় গোস্বামীপাদগণের মত নয় একথা নিশ্চিত ভাবে জানতে হবে। তবে প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে যে, ষড় গোস্বামীপাদগণই হলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ণীত সাক্ষাৎভাবে কৃপাভিষিক্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের মূল প্রবর্ত্তক ও মূল আচার্য্য।

সুতরাং সকল প্রকার কপটতা রহিত হয়ে সরল চিত্তে প্রভুর যে পরিকরের যে আদর্শকে যিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করবেন, তিনি তাঁতেই সেই পরিকরের ভাবকেই লাভ করবেন, জীবন ধন্য হবে এতে অনুমাত্রও সন্দেহ নেই। তথাপি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে অবশ্যই তারতম্য আছে, সেই দৃষ্টিকোণে বলা যায়, শ্রীস্বরূপ-রামরায়-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য পাদগণের সিদ্ধান্ত ও আস্বাদনই সর্ব্বোপরি রসপরিপাটীর উচ্চতম শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নেই। কারণ,

ইঁহারাই প্রভুর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পরিকর ও প্রভুর সাক্ষাৎভাবে কৃপাভিষিক্ত আচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এনারা স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র নন্দন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ বলেই জানতেন, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই নিজের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্যই শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব হৃদয়ে ধারণ করে শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অন্য ভগবৎ স্বরূপরূপে কল্পনা করার অস্তিত্বই তাঁদের মনের মধ্যে ছিল না। তাই শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রমুখ শ্রীধামবৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণবাচার্য্য পাদগণ অনুভবে, আচরণে ও রচনায় পৃথক্ ভাবে শ্রীগৌর মন্ত্রের কোন প্রয়োজনই মনে করেন নাই।

শ্রীস্বরূপ দামোদর রায়রামানন্দ, শ্রীরূপ-সনাতন রঘুনাথ প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকরগণের নির্ণীত সিদ্ধান্তই কবিরাজের কলমে দেদীপ্যমান হয়ে আছে। এখানে সংশয়-সন্দেহের কোন জায়গাই নেই।

যথা—"**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঙি ব্রজেন্দ্র কুমার।**
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণের সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।
(চৈঃ চঃ আদি ৪ পরিঃ)

এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্পষ্টভাবেই ব্রজেন্দ্র কুমার শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসময় মূর্ত্তি হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রেই প্রভুর উপাসনা সর্ব্বোত্তম। প্রভু নিজেই তা চাক্ষুষ দেখিয়েছেন শিশু লীলায়। প্রভু তৈর্থিক ব্রাহ্মণের কৃষ্ণমন্ত্রে নিবেদিত অন্ন তিনবার ভোজন করেছেন। শেষে কৃপা করে দর্শন দিয়ে তৈর্থিক ব্রাহ্মণের কাছে হাস্‌তে হাস্‌তে

বলেছেন—"তুমি বেশ লোক তো, আমাকে ভোজন করার জন্য আহ্বান করছ, আর আমি যেই ভোজন করতে আসছি অমনি চীৎকার চেঁচামেচি করে পাড়াশুদ্ধ লোক জড় করছ, আবার বলছ আমার নৈবেদ্য ভোগ নষ্ট হয়ে গেল।" শিশু নিমাইয়ের কথা শুনে বিপ্র হতবাক্,—এ শিশু বলে কি! আমি তোমাকে ডাকছি? আমি তো আমার ইষ্টদেব ব্রজবিহারী কৃষ্ণকে ডাকছি। এইবার প্রভু বলছেন—তাহলে দেখ আমি কে—

প্রভু বলে অয়ে বিপ্র তুমিত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার।।
মোর মন্ত্র জপি মোরে কর আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান।।
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভূজ রূপ।
একহস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি, ৪র্থ পঃ)

ইত্যাদি প্রকার প্রভু নিজেকে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ রূপে দর্শন করিয়েছিলেন। এ কথা সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দ জানেন। তৈর্থিক বিপ্র কি গৌরমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন? প্রভুর শ্রীমুখের উক্তির উপরেও সন্দেহ? তাঁর উক্তির উপরেও আবার বিচার চলে কী? "তাহলে কৃষ্ণমন্ত্রে গৌর ভজন হয় না" একথা আর বলা যেতে পারে কী? শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের আহ্বানে প্রভু গৌরসুন্দর কেন অন্ন ভোজন করেছিলেন? সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে গৌর ভজন করুন, কিম্বা গৌরমন্ত্রে গৌরভজন করুন, একই ভগবানের মন্ত্র ও একই

উপাসনা, কারণ এখানে গৌর কৃষ্ণ দুজন পৃথক ভগবান নন। এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করলে শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রকৃত তত্ত্বই অজ্ঞাত থেকে যায়। অতএব তর্ক না করে যার যে মন্ত্রে, যে স্বরূপে, নিষ্ঠা তিনি তাই করবেন, কদাপি তর্ক দ্বারা নিজের চিত্তকে দূষিত করবেন না। তবে একথা সুনিশ্চিত সত্য যে, যিনি বলেন কলিযুগে গৌর-মন্ত্র ব্যতীত উদ্ধার হবে না, বা গৌর ভগবানের কৃপা লাভ হবে না, এটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত কাল্পনিক-ভাবনা।

প্রসঙ্গ হিসাবে আলোচনা অনেক বিস্তার হয়ে গেল, যদিও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আর মহতের অনুভব যে সুদৃঢ় প্রমাণ বলা হয়েছে, সেই বিচারে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা যায়, তথাপি যদি সেই বিচারে কেহ ক্ষুন্ন হোন্ এজন্য দীনবৎসল গৌর-ভক্তবৃন্দগণ এ অধমকে ক্ষমা করবেন এই প্রার্থনা।

তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রত্যেকেরই প্রধান উপাস্য হলেন — শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ। একথাই শ্রীমৎ কবিরাজ পাদ সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দকে জানিয়েছেন। যথা—

"যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণে ভক্তি বিনা নাহি দানে অন্য।।
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তাঁর পদ ছায়া।
মো হেন অধমে দিলা নিত্যানন্দ-দয়া।।"

(চৈঃ চঃ আদি ৫ পরিঃ)

অর্থাৎ যিনি শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রাণের প্রাণ রূপে প্রীতি করেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণেই যাঁর অনন্য নিষ্ঠা, এই রকম বৈষ্ণবকেই কবিরাজ পাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলেছেন।

এখন আলোচ্য প্রসঙ্গে আসছি, পণ্ডিত বাবা বর্ষাণে প্রায়

আট বৎসর গোপনে বাস করার পর গৌরমন্ত্রের বাদ-বিবাদ তখনকার মত সমাপ্ত হলে আবার রাঘবের গোফায় গিয়ে ভজন করতে থাকেন। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এক নিয়মে তীব্র ভজন করলেন। ঐ সময়ে তিনটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল।

(১) মাঘমাসের এক কন্ কনে শীতের রাত্রিতে তিনি কয়লার আগুণ নিয়ে গোফার মধ্যে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করেন। কয়লার গ্যাসে মানুষের প্রাণহানি পর্য্যন্ত হতে পারে—তাঁ তার জানা ছিল না। বিষাক্ত গ্যাসে তিনি গোফার মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে যান, কিন্তু কোন অলক্ষ্য সিদ্ধদেবতা তাঁকে গোফার ভিতর থেকে বাহিরে গোবর্দ্ধনের তটদেশে রেখে চলে যান। প্রভাত কালে চেতনা হলে দেখেন গোফার বাইরে পড়ে আছেন। দুদিন পর্য্যন্ত তাঁর চলচ্ছক্তি ছিল না।

(২) আর একটি ঘটনা ঘটেছিল—একদিন পুছরি গ্রামে এক মহোৎসব হয়েছিল। দু-জন ভাঙ্গী-চোর পুয়া এবং দক্ষিণার টাকা কিছু পাওয়া যাবে এই আশা করে পণ্ডিত বাবার গোফায় হানা দেয়। কিছু না পেয়ে বাবার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে, রক্তাক্ত অবস্থা দেখে তাদের মধ্যে একজন চোর উনের বস্ত্র দ্বারা মস্তকে বেধে দিয়ে চলে যায়।

(৩) একদিন দিবাভাগে এক বিষধর সর্প তাঁর গলা ও বুক বেষ্টন করে কতক্ষণ বাদে সর্পটি আপনিই চলে যায়।

পণ্ডিত বাবা সেদিন রাত্রে এক গম্ভীর ধ্বনি শুন্‌তে পেলেন—“তুমি এই গোফা থেকে অন্যত্র চলে যাও।”

এইভাবে ত্রিশ বৎসর কাল অতিবাহিত হলে পণ্ডিত বাবা কুসুম সরোবরের নিকট শ্যামকুটীতে চলে আসেন।

ঐ সময়ে গোয়ালিয়রের রাজা মাধব রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলবন্ত রাও, তার মাতার চোদ্দ লক্ষ টাকার অলঙ্কার থেকে গোপনে বৈষ্ণবগণকে দান করার উদ্দেশ্যে কুসুম সরোবরে পণ্ডিত বাবার নিকট উপস্থিত হোন্ এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার জন্য বিশাল মঠ মন্দির করার আগ্রহ প্রকাশ করে অনেক কাকুতি মিনতি কর্‌তে থাকেন। কিন্তু পণ্ডিত বাবা ছিলেন মনে প্রাণে সত্যকার সাধু, তাঁর সুদীর্ঘ বৈরাগ্য জীবনের মধ্যে বৈরাগ্যের শুভ্রতার ভিতর কোন দাগ ছিল না। রাঘবের গোফায় থাকাকালীন সেখানেও একবার এই বলবন্ত রায় মহোদয়, পণ্ডিত বাবার সাধন-সম্পত্তির কণিকা পাওয়ার লোভে একবার হানা দিয়েছিলেন। তখন যেমন তিরস্কার করে প্রত্যাখান করেছিলেন এখনও তাই সেই রকমই কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

কিন্তু সত্যকার সাধু যাঁরা, তাঁদের প্রদত্ত তিরস্কার, অপমান ও রূঢ়ভাষা যিনি বিপুল ধনের অভিমান, রাজ-সম্মানের বিশাল মর্য্যাদাকেও তুচ্ছ বুদ্ধি করে সাধুর পদরজের প্রতি মহা সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন, তিনি অবশ্যই কিছু না কিছু পানই, তাঁকে কখনও রিক্তহস্তে ফির্‌তে হয় না। তাঁর ব্যাকুল ভাব দেখে অবশেষে পণ্ডিত বাবা শান্ত ভাবে জানালেন—দেখুন, আমি ব্রজবাসীদের ঘরের মাধুকরী দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করি, ব্রজের বাইরের কোন বস্তু গ্রহণ করিনি, তাছাড়া মঠবাসী হয়ে নিজেকে একস্থানে আবদ্ধ করে রাখা আমার পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব। আর আমি আজ পর্য্যন্ত কোন গৃহস্থ বা কোন বৈরাগী ব্যক্তিকেও শিষ্য করিনি। তবে তোমাকে আমি একটা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি- ‘‘আমার

বড় গুরুভাই শ্রীমৎ গৌরশিরোমণি মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীহরিচরণ দাসজীর নিকট যাও।" এই ভাবে পণ্ডিত বাবা তাঁকে বিদায় দিলে তখন নিরূপায় হয়ে ঐ টাকা শ্রীহরিচরণ দাসজীকেই অর্পণ করেন। তিনি ঐ অর্থ দ্বারা মন্দির নির্মাণ করেন, ঠাকুর সেবার ও বৈষ্ণব সেবারও রীতিমত ব্যবস্থা করেন।

বর্ত্তমানে কুসুম সরোবরের নিকট গোয়ালিয়র মন্দির নামে যে মন্দির বর্ত্তমানে আছে, উহাই বলবন্ত রায় এর প্রদত্ত অর্থ দ্বারা শ্রীহরিচরণ দাসজী নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। আর তিনিই ঐ মন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীহরিনারায়ণ শর্মা মহোদয়ের রচনা থেকে জানা যায়, বাবার কনিষ্ঠা ভগিনী মধ্যে মধ্যে জয়পুর থেকে পণ্ডিত বাবার দর্শন করতে আসতেন। একদিন কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মোতি দেবী বড়ভাই পণ্ডিত বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—দাদা, আপনি বলবন্ত রায় মহাশয়ের টাকা না গ্রহণ করে ফিরিয়ে দিলেন কেন? আপনি তো নিজেই মন্দির করে একস্থানে বাস করে ভজন কর্‌তে পারতেন। তখন পণ্ডিত বাবা উত্তর দিয়েছিলেন।—'না জেনে কোন দান গ্রহণ করলে কি বিরাট হানি হয়, তোমরা কি দেখতে পাওনি? শ্রীহরিচরণ দাসজীর হাতের কি অবস্থা হয়েছে?"

এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত দান গ্রহণ করার কিছু দিন পর থেকেই শ্রীহরিচরণ দাসজীর ডান হাতে এক ভীষণ ক্ষয় রোগ হয়েছিল, এবং তাতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাহলে বুঝুন, মাদৃশ জীব মোটা মোটা দান গ্রহণের জন্য চাতুরী করতেও পিছপা হইনা, এযে কতবড় মারাত্মক হানিকর, তার কোন অনুসন্ধান

করিনি। এর কুফলই হল মনের গতি অর্থ ও ধন-সম্পদের দিকেই ধাবমান হয়ে থাকা। ভগবৎ স্মৃতি জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই হল বিষয়ী লোকদের কাছে মোটা দান গ্রহণ করার চরম কুফল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অবশেষে কয়েকটা নিয়ম রক্ষা ছাড়া ভগবৎ স্মৃতির সাথে আর কোন সম্পর্ক থাকে না। বিষয়ের এমনই প্রবল প্রভাব। যাই হোক্ শ্যামকুটীতে অবস্থান কালে শ্রীগৌরাঙ্গ দাসজী যিনি পরমপূজ্যপাদ প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য, এবং শ্রীপ্রিয়াশরণ দাসজী পণ্ডিত বাবার আনুগত্য স্বীকার করে ভজন করতে থাকেন। ঐ সময়ে অনেক ভজন নিষ্ঠ মহাত্মা বৈষ্ণবগণ এবং ভজনতত্ত্ব জিজ্ঞাসু সজ্জন ভক্তবৃন্দ পণ্ডিত বাবার নিকট সৎসঙ্গ করতে আসতেন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন—রাজর্ষি বনমালী রায়বাহাদুর এবং রাজর্ষি মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় প্রভৃতি।

উক্ত শ্যামকুটীতে থাকা কালেই শ্রীকৃপাসিন্ধু বাবা ইঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন। পণ্ডিত বাবার প্রকট-জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই কৃপাসিন্ধু বাবা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সমগ্র জীবন ব্যাপী বাবার সেবাতেই নিজেকে উৎসর্গ করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে রমণরেতি অঞ্চলে ছটীকরা রোডের উপরে যে 'শ্রীভাগবত নিবাস' নামক আড়ম্বর-হীন বিরাট আশ্রম দেখা যায়, উহাই শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস বাবা পণ্ডিত বাবার অপ্রকটের পর কেবলমাত্র ভজননিষ্ঠ বিরক্ত বৈষ্ণবগণের জন্য নির্ম্মাণ করেন।

পণ্ডিত শ্রীহরি নারায়ণ শর্মা মহোদয়ের রচনা থেকে জানা যায়,—শ্যামকুটীতে অবস্থান কালে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিখ্যাত

দেশপ্রেমিক শ্রীসুভাষ চন্দ্র বোস মহোদয় পণ্ডিত বাবার নিকট আগমন করেছিলেন। ইংরেজ অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে ভ্রমণ করতে করতে একান্ত নির্জ্জন স্থান বৃন্দাবনে কুসুমসরোবরের নিকট তখন আগমন করেন ও পণ্ডিত বাবার বৈরাগ্য-জীবন ও সুতীব্র ভজন-নিষ্ঠার কথা শুনেই পণ্ডিত বাবার কাছে উপদেশ নিতে গিয়েছিলেন। পণ্ডিত বাবাকে দর্শন করে নেতাজী অতি মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। কিসে মনের শান্তি লাভ হয় তার প্রশস্ত সরল মার্গ কি? প্রশ্ন করলে,—পণ্ডিত বাবা বলেছিলেন—'বোসবাবু! ভজনানন্দ প্রাপ্ত করুন, ভগবদ্ ভজন দ্বারা অবশ্যই আপনার মানসিক শান্তি লাভ হবে, ইহাই শান্তি লাভের সরল পন্থা।" তখন উত্তরে বোসবাবু বলেছিলেন,—বাবা! আপনার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সত্য এবং যথার্থ, আপনার মার্গ-প্রদর্শন অতি শ্রেষ্ঠ ও উচ্চকোটির মার্গ। পরন্তু বাবা! আজ স্বদেশ পদ দলিত, পবিত্র ভারতবর্ষ এক গোলামী দেশে পরিণত হয়ে আছে, ভারতমাতা আজ বিদেশীর অত্যাচারে পীড়িত, এমন অবস্থায় আমি একান্তে বসে কি করে ভজন করব? তবে আপনার আদেশ অনুসারে আমি কিছু কিছু অবশ্যই অভ্যাস করব, বাবা! আমি ক্ষমা প্রার্থী, আমাকে ক্ষমা করবেন।' পণ্ডিত বাবা তখন মিষ্টি-মধুর হাসির সাথে দেখতে থাকেন, আর কিছু বলেন না। নেতাজী পণ্ডিতবাবাকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। সেই সময় শ্রীকৃপাসিন্ধু বাবা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

যাই হোক্, প্রায় আট বৎসর কুসুমসরোবরের নিকট শ্যামকুটিতে থাকার পর ইংরাজী ১৯১৮ সালে পণ্ডিত বাবা

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হোন, তখন শ্রীবৃন্দাবন থেকে শ্রীল কামিনী কুমার ঘোষ মহোদয় ও শ্রীদীনেশ চরণ দাসজী প্রভৃতি শ্যামকুটীতে গমন করেন, এবং শ্যামকুটী থেকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনজীর বাগিচায় পণ্ডিত বাবাকে নিয়ে গেলেন। কিছু দিন বাদে পণ্ডিত বাবা সুস্থ হলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনে এই সময় ভীষণ জলপ্লাবন ও প্লেগ হওয়ায় তিনি বৃন্দাবনে টাটিয়া আশ্রমে বাস করেন। ঐ সময়ে দুই বৎসর যাবৎ মথুরার শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টের নিকট শ্রীহরি কথা শ্রবণ করেন।

এইভাবে ক্রমে কেটারী বনে, দিল্লীর ধর্ম্মশালায় শ্রীমদনমোহন বাগিচায় তিন বৎসর বাস করেন। এই সময়ে ইনি বৈষ্ণব-জগতের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীগৌরাঙ্গ দাসজীকে ষট্ সন্দর্ভাদি বৈষ্ণব দর্শন অধ্যয়ন করান, শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসজীকে সেবায় অঙ্গীকার করে ভজন ও বৈরাগ্য বিষয়ে শিক্ষা দান করেন এবং কঠোর ভাবে শাসনও করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে জলপ্লাবন দেখা দিলে পণ্ডিত বাবা মীর্জাপুরের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নেন, ছয় মাস পরে করোলীকুঞ্জে বাস কালে আবার ভীষণভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এই সময়ে তাঁর দেহ নির্য্যাণের উপক্রম হলে শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসজী দারুন দুঃখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে কাতর প্রার্থনা করতে থাকেন, তখন প্রভু স্বপ্নে কৃপা করেন। ১৩৩২ সনে কার্ত্তিক মাসে দাউজীর বাগিচায় আসেন এবং অচিরেই পণ্ডিত বাবা আরোগ্য লাভ করেন। এরপর থেকে তিনি ক্রমে

ক্রমে অন্তর্মনা হতে থাকেন, ভজনে প্রগাঢ় অভিনিবেশ হওয়ায় তাঁর আহারাদির প্রতি ঔদাসীন্য বৃদ্ধি হতে থাকে। ঐ সময়ে সেবক শ্রীকৃপাসিন্ধু বাবাও ভজনে অভিনিবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করলে পণ্ডিত বাবার সেবার প্রতি ঔদাসীন্য ভাব দেখে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নে কঠোর ভাবে তিরস্কার করেন। তারপর থেকে তিনি পণ্ডিত বাবার সেবা ব্যতীত আর কিছু জানতেন না।

দাউজী বাগিচায় পণ্ডিত বাবা প্রায় পনের বৎসর অবস্থানের পর ঐ স্থানেই তিনি অপ্রকট হয়েছিলেন। শেষের দিকে তাঁর আহারের কোন চেষ্টাই ছিলনা। দেহের পুষ্টি হত অপ্রাকৃত অলৌকিক গোবিন্দ লীলামৃত পানের দ্বারা।
কবিরাজের লেখনীতে তার প্রমাণ দেদীপ্যমান হয়ে আছে।

"শশ্বচ্চর্বিতমেব ভুরি রসদং দেহাদিহৃৎ পুষ্টিদম্।
তজ্জীয়াদমৃত-স্পৃহাহরমিদং গোবিন্দলীলামৃতম্।।

(শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত-১।৫)

শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত রস-শাস্ত্রের অমোঘ বাক্যগুলি সর্ব্বকালেই ধ্রুবসত্য, তথাপি তার বাস্তব রূপায়ণ হয় মহাপুরুষদের জীবনে, কারণ অপ্রাকৃত অলৌকিক বস্তুর আস্বাদনের জন্য চিত্তের যে শুদ্ধতার প্রয়োজন, অন্তরে যে তীব্র লালসার আবশ্যক এবং সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হওয়া অনিবার্য্য হয়, সেটা তাঁদের জীবনে পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ে শ্রীবিষ্ণুদাস বাবা পণ্ডিত বাবার কৃপা-সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি শ্রীকপাসিন্ধু বাবার আনুগত্যে পণ্ডিত বাবার কিছু কিছু সেবা

করারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ ৮-১০ বৎসর সঙ্গ লাভে ধন্যাতিধন্য হয়েছিলেন।

পণ্ডিত বাবা প্রাকৃত-জগতের তুচ্ছ বিষয় সম্পদকে ঘৃণাস্পদ বস্তুর মতই ত্যাগ করেছিলেন। জগতের মান-সম্মানকে শূকরী বিষ্ঠার মতই বহুদূর থেকেই সর্ব্বান্তঃকরণে পরিহার করেছিলেন। এক কথায় বলা যায়—যা কিছু সাধু জীবনকে দূষিত করে, ভজনানন্দকে খর্ব করে, মহত্ত্বকে কলুষিত করে এবং ভগবৎ পাদ পদ্মের মকরন্দ সুধা থেকে বঞ্চিত করে, এই রকম সর্বপ্রকার বিষয়কে তিনি পায়ের আঙ্গুল দিয়েও স্পর্শ করতেন না। সেবার দোহাই দিয়ে, কিম্বা প্রভুর জন্য, বা জগতের মঙ্গলের জন্য ইত্যাদি কোন অজুহাতেই বিষয় সম্পদকে কখনও কোন অবস্থাতেই স্বীকার করেন নাই। শেষ জীবন রোগ-জীর্ণ কলেবর নিয়েও বৈরাগ্য নিষ্ঠা থেকে একটুও সরে যাননি, পক্ষান্তরে তিনি দিব্য-রসের আস্বাদনে নিজের অন্তরকে এমন ভাবে পূর্ণ করে রেখেছিলেন যে, বহির্জগতের কোন বস্তুরই জীবনে প্রয়োজনও অনুভব করেন নি। এই কারণেই তিনি গোয়ালিয়রের রাজার ছোটভাই শ্রীবলবন্ত রায়কে এবং পরবর্ত্তী কালে বৃন্দাবনে দাউজী বাগিচায় অবস্থিতি কালে জয়পুর রাজা শ্রীমাধব সিংহজীর সকল প্রকার অনুনয়-বিনয়কে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অথচ শ্রীমাধব সিংহজী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ সেবী নিষ্ঠাবান্ শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে 'শ্রীরাধামাধব মন্দির বা জয়পুরীয় মন্দির' নামে যে বিখ্যাত বিশাল মন্দির বিদ্যমান আছে, যার মধ্যে প্রভূত শিল্পকলার নানা কারুকার্য্য বিখচিত, তা এই জয়পুর রাজা শ্রীমাধব

সিংহজীরই নির্মিত। তাঁর শ্রীগুরুদেব ছিলেন শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীব্রহ্মচারীজী মহারাজ।

শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে যখন এক মহতী ধর্ম্ম সভার আয়োজন হয়। সেই সভার মধ্যে ভাষণ দেবার সময় শ্রীব্রহ্মচারীজী ও অন্যান্য প্রবক্তা পণ্ডিত মহাত্মাগণ পণ্ডিত বাবা শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দাসজী মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পণ্ডিত বাবাকে জয়পুরীয় মহাত্মা রূপে প্রথমে প্রদর্শন করে তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভজন নিষ্ঠা ও ব্রজবাস নিষ্ঠা প্রভৃতি মহত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তখন থেকেই জয়পুর রাজা পণ্ডিত বাবার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন। বর্ত্তমানে বর্ষাণে শ্রীরাধারাণী মন্দিরের দক্ষিণভাগে পর্ব্বতের উপর যে বিশাল মন্দির দৃষ্ট হয়, এই জয়পুর মহারাজ মাধব সিংহজীই নির্ম্মাণ করেছিলেন। যাই হোক্ ঐ ধর্ম সভায় পণ্ডিত বাবার মহিমা শুনে তিনি দাউজী বাগিচায় গমন করেন ও পণ্ডিত বাবাকে দর্শন করে প্রার্থনা করেছিলেন যে, "যদি এ দাসের প্রতি অনুকম্পা হয়, আপনি এবং আপনার সাথী মহাত্মা বৈষ্ণবগণের থাকা এবং প্রসাদ পাওয়ার সুব্যবস্থা করতে চাই।"

পণ্ডিত বাবা জয়পুর মহারাজের প্রস্তাবকে হাসি মুখে প্রশংসা করেন ও তাঁকে ধন্যবাদ দেন, তারপর বলেন—'মহারাজা সাহেব, বৈভব-বিশালতা ও মন্দিরের প্রতি যদি আমার লেশমাত্রও মোহ থাকত, তাহলে স্বর্গীয় জয়পুর মহারাজ রাম সিংহজীর সঙ্গ আমি কেন ছেড়ে দিতাম? আপনাদের কৃপায় এক ছোট জায়গীর,

আর এক ব্রাহ্মণের বাস করার যোগ্য বাসভবন, আজও জয়পুরে বর্ত্তমান আছে।

এইসব কিছুকে ছেড়ে ভজন করার জন্যই বৃন্দাবনে এসেছি। এখন আমি একজন বৈরাগী, ব্রজ-বৃক্ষের পবিত্র স্নিগ্ধ ছায়াই আমার নিবাসস্থান। ব্রাজবাসীগণের গৃহের মাধুকরী-টুকরো গ্রহণ করে আর যমুনার জল পান করে সদা পরিতৃপ্ত থাকি। সুতরাং এই বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আর পবিত্র নৈসর্গিক আনন্দ থেকে আপনি কৃপা করে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন না।"

পণ্ডিত বাবার এই কথা শুনে বিস্মিত জয়পুর মহারাজ বলেই ফেল্লেন—"আপনার সম্পর্কে আমি যা শুনেছিলাম, কিন্তু আপনি তা অপেক্ষা অনেক অনেক গুণে মহান্" একথা বলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে দাউজী বাগিচা থেকে প্রস্থান করেন।

পণ্ডিত বাবার এই সকল আচরণ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রেম চিন্তামণি লাভের যথার্থই যোগ্য পাত্র ছিলেন। যথার্থ ভাবেই তিনি ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তার মর্মকে সত্যই অনুভব করেছিলেন। তাই ভগবদ্ভজনই তাঁর জীবনের মহাধন হয়েছিল। শ্রীমদ্বিষ্ণু পুরী গোস্বামী পাদ 'বিষ্ণু ভক্তিরত্নাবলী' গ্রন্থের প্রথমেই লিখেছেন,—"শুভ ভাগবত অমৃত সিন্ধুতে যে রত্ন আছে, তাহা পান্না-চূনী-হীরা-মণি-মুক্তা নয়, সেই দিব্য মহারত্নের নাম 'ভগবদ্ভজন'। তবে কৃষ্ণ কৃপার নির্মল অঞ্জন ব্যতীত সেই রত্নকে কেহই দেখতে পায় না। ব্যাকুল প্রার্থনা করলে কৃপার দ্বারা দেখা যায়, যথা—

দূরান্নিশম্য মহিমানমুপেত্য পার্শ্ব-
মন্তঃ প্রবিশ্য শুভ ভাগবতামৃতাব্ধেঃ
পশ্যামি কৃষ্ণ করুণাঞ্জন নির্ম্মলেন
হৃল্লোচনেন ভগবদ্ভজনং হি রত্নম্।।

(বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী)

বর্ত্তমানে মান-সম্মান আর অর্থ-সম্পদ-সর্ব্বস্ব জগতে ও জন সমাজে তার খোঁজ খবর অনুসন্ধান কি করে হতে পারে? আজ বিশাল বিশাল মঠ মন্দির, বিপুল আড়ম্বরের সাথে নির্মিত হচ্ছে, বিরাট বিরাট ধর্মসভা ও মহোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞাপনের যুগে গৃহে গৃহে ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রুত হচ্ছে, বিদ্বান্‌গণ অতি নৈপুণ্যের সাথে ভক্ত-ভক্তি-ভগবানের দুর্গম তত্ত্বকেও সহজভাবে জনতার কাছে এবং ভক্ত-সমাজে উপস্থাপিত করে চলেছেন, কিন্তু হায়! জীবনে যে দারিদ্রের কথা প্রভু শুনিয়েছেন, জীবনের সেই ব্যর্থতা, সেই দরিদ্রতাকে অনুভব করার সামর্থ্য টুকুও জীবনে উপলব্ধি হচ্ছে না।

প্রভুর উক্তি- **'প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন'**
'কৃষ্ণ স্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল-জীবন''

(চৈঃ চঃ অঃ ২০ পঃ / ঐ আ ১২ পঃ)

কিন্তু মাদৃশ জীব লৌকিক ধনের পশ্চাতেই ধাবমান। প্রেম লাভই যে জীবনের সার্থকতা, প্রেমভক্তিই যে প্রকৃত ধন, প্রেম ধন বিনা যে জীবন ব্যর্থ হয়, এই বিবেকই হৃদয়ে অনুভব হয় না। মঠাদিতে অনুষ্ঠিত অতি প্রাথমিক ধর্মকেই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম বলে মনে করা হয় আর ঐ রকম প্রচারও করা হয়।

যাই হোক্ পণ্ডিত বাবা দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর গোফায় বসে যে ভজন-রত্ন আহরণ করেছিলেন, তারপর কুসুম সরোবরের তীরে শ্যামকুটীতে আসার পর থেকে তিনি যথেষ্ট ভাবে সেই ভজন-রত্ন বিতরণও করেছিলেন। পণ্ডিত বাবার এই কৃপার জন্যই অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাধু-মহাত্মাগণ এবং জ্ঞানী-গুণী সজ্জন ভক্তগণ তাঁর চরণ-ছত্র ছায়ায় বসে সৎসঙ্গ প্রাপ্ত করার মহাসৌভাগ্য লাভ করে জীবনকে ধন্য করেছেন।

তিনি সম্প্রদায় জাতি-কুল নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমদর্শিতার ভাব রাখতেন। তাই তাঁর সহজ সরল অকপট ব্যবহারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-মহাত্মাগণই তাঁর কাছে যাতায়াত কর্তেন। বুদ্ধগয়া ধামে শঙ্কর-মঠের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণানন্দ সরস্বতীপাদ বেদান্ত-বিচার ছেড়ে প্রেমভক্তি রসে মেতেছিলেন, এই বাবারই অদ্ভুত মহিমায় মুগ্ধ হয়ে। পুরীধামে গম্ভীরার শ্রীরাধাকান্ত মঠের মহান্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাসজী মহারাজ যিনি তৎকালে মহা বিরক্ত সাধুরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দবংশাবতংস বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ ভাগবততত্ত্ববেত্ত্বা সুবিখ্যাত ভাগবত প্রবক্তা রূপে কীর্ত্তি বিস্তার করেছেন, সেই প্রভুপাদ্ শ্রীপ্রাণ গোপাল গোস্বামী, বেদান্তরত্ন শিরোমণি শ্রীমৎ বিনোদ বিহারী গোস্বামীপাদ, শ্রীঅমূলক রাম শাস্ত্রীজী মহারাজ, শ্রীপুরুষোত্তম ভট্ট, শ্রীভগবান দাস মহান্তজী মহারাজ, শ্রীহংস দাসজী মহারাজ, শ্রীসংকর্ষণ দাসজী মহারাজ এবং শ্রীপ্রিয়া শরণ দাসজী মহারাজ ও শ্রীগৌরাঙ্গ দাসজী মহারাজের কথা পূর্ব্বেই জানানো হয়েছে। এই সব মহাত্মাগণ

পণ্ডিত বাবার কৃপা লাভে ধন্যাতিধন্য হয়েছেন। এনারা কেহ নিম্বার্কী, কেহ রাধাবল্লভী, কেহ সন্ন্যাসী, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তো ছিলেনই।

এখানে পণ্ডিত বাবার আশ্চর্য্য চরিত্র এই যে, তিনি যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন, তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না, সকলেই মনে করতেন ইনি আমাদের সম্প্রদায়েরই একজন আচার্য্য। তিনি সুদীর্ঘ-সাধু-জীবনে কাকেও শিষ্য করেন নি। অথচ তাঁকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধু-মহাত্মাগণ নিজ সম্প্রদায়াচার্য্য রূপে অনুভব করতেন, এটাই তাঁর অলৌকিক আশ্চর্য্য মহিমা। প্রত্যেক সাধু-মহাত্মার কাছে তত্তৎ সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে এমনই সুন্দর বিশ্লেষণ করতেন, তার ফলেই সকলেই তাঁকে নিজ সম্প্রদায়-আচার্য্য রূপেই ভাবতেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম। তিনি বাল্যকাল থেকেই যে বিশাল জ্ঞানামৃত ভাণ্ডার আহরণ করেছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তা নিজ অনুভব দ্বারা আরও রসায়িত করে অকাতরে দানও করেছিলেন। পণ্ডিত বাবার চরিত্রে আর এক অলৌকিক শক্তি অনেকেই অনুভব করেছেন, তা এই যে তাঁর সামনে বসলেই শাস্ত্রের কোন দুর্ব্বোধ্য-বিষয়ের অর্থও সহজভাবে হৃদয়ে অনুভব হত।

রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্য ষড়্দর্শনাচার্য্য শ্রীল সুদর্শন আচার্য্য মহারাজ বলতেন,—শাস্ত্রের কোন কঠিন বিষয়ের মীমাংসা আমার অসাধ্য হলে, পণ্ডিত বাবার সম্মুখে বস্‌লেই তা আমি অনায়াসে মীমাংসা করতে পারতাম।

শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী সভামধ্যে উর্দ্ধবাহু করে বলেছেন,—"আমার অবোধ্য শাস্ত্র সিদ্ধান্তগুলি লিখে রাখি। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবার সম্মুখে কখনও গেলে অথবা তিনি কোনও সভায় আমার সম্মুখে আসলে সেই অমীমাংসিত স্থলগুলির সুসিদ্ধান্ত আমার স্ফূর্ত্তি পেয়ে থাকে, এ ছাড়া আমার মনোবুদ্ধির অগোচর সিদ্ধান্তগুলিও আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সিদ্ধ পণ্ডিত বাবার জীবন-চরিতকে তাঁর সেবক শ্রীকৃপাসিন্ধু বাবা গীতিছন্দে অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছিলেন। তিনি ঐ রচনার নাম দিয়েছেন— "অচিন্ত্য-চিন্তামণি" অর্থাৎ প্রাকৃত চিন্তামনি হতেও অতি বিলক্ষণ চিন্তামনি হলেন সিদ্ধ পণ্ডিত বাবা। তাই তাঁর সান্নিধ্যে আসামাত্রই জীবন পবিত্রময়, জ্ঞানময় ও ভক্তিময় হয়ে যায়। সুতরাং শ্রীপণ্ডিত বাবাকে শ্রীকৃপাসিন্ধু বাবা 'অচিন্ত্য চিন্তামণি' সংজ্ঞাটি যথার্থই দিয়েছেন। যাইহোক্ এই অলৌকিক শক্তিটি তাঁর শ্রীগুরুদেব সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের কৃপা-প্রসূত বলেই অনেকে মনে করেন।

শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ প্রাণ গোপাল গোস্বামীর প্রতি পণ্ডিত বাবার যে অতিশয় কৃপা ছিল, তা তো তিনি ভাগবত পাঠের আসরেই বলতেন, একথা 'অচিন্ত্য-চিন্তামণি' গীতি-রচনাতেও পণ্ডিত বাবার সেবক শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস বাবাও লিখে গেছেন।

যথা— **প্রভু শ্রীপ্রাণ গোপাল, তিঁহ পরম দয়াল,**
বিদ্যা ভক্তি বহুগুণ খনি।
শ্রীনিত্যানন্দ বংশধর, তারিতে দুঃখী পামর,
প্রতাপে প্রচণ্ড দিনমণি।।

যোগ্য পাত্র বিবেচিয়া, পরম আনন্দ হিয়া,
সিদ্ধান্ত রতন দিলা দান।
গৌরাঙ্গ-স্বরূপ কথা, লীলা গুণ-তত্ত্ব-গাথা,
নিত্যানন্দ স্বরূপ আখ্যান।।
রাধিকা স্বরূপ ভাব, গুণ প্রেম অনুভাব,
সেবাপরা সখীর মহিমা।
ভাব ভক্তি অকিঞ্চন, প্রেম সেবন সাধন,
শাস্ত্র যুক্তি সদাচার সীমা।।
অমূল্য রতন পাইয়া, তিঁহ পূর্ব্বদেশে গিয়া,
দীনহীনে দিলেন যাচিয়া।
তাঁর কীর্ত্তি হর্ষান্বিতে, ভক্তি সন্দর্ভ প্রকাশিতে,
আদ্যপত্রে রেখেছে লিখিয়া।।

তিনি আরও লিখেছেন,—

বিনোদ বিহারী গোঁসাই, যাঁর গুণের অন্ত নাই,
বেদান্ত রতন শিরোমণি।
অমানী মানদ ধীর, দয়ালু বদান্য বীর,
ভকতি বৈরাগ্য রত্ন-খনি।।
গদাধর শ্রীচরণ, যাঁহার একান্ত ধন,
জগ মাহি বড় ভাগ্যবান্।
ভবিষ্য জীবের তরে, ভাণ্ডার তাহার করে,
সমর্পিয়া হৈলা অন্তর্ধান।।
আশ্বিনী কৃষ্ণা চতুর্থী, অন্ধকার করি পৃথ্বী,
ভাগ্য চন্দ্র অস্তমিত হৈল।

কৃপাসিন্ধু ভাগ্যমন্দ, পথহারা হৈল অন্ধ,
ভবকূপে ডুবিয়া মরিল।।"

পূজ্যপাদ বিদ্বৎ শিরোমণি শ্রীশ্রীহরিদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব জীবন, গ্রন্থে জানা যায়, "শ্রীশ্রীভূগর্ভ গোস্বামীপাদের সন্তান পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বেদান্ত রত্ন গোস্বামীজীকে বিশেষভাবে কৃপা করে পণ্ডিত বাবা একদিন বেশাশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করেন।"

পণ্ডিত বাবা আজ থেকে ৭৪ বৎসর পূর্ব্বে ৮৩ বৎসর বয়সে, ইঃ ১৯৪০সালে, শ্রীবৃন্দাবনে দাউজী বগিচায় নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন।

তাঁর সুদীর্ঘ-বৈরাগ্য জীবনে ইষ্ট নিষ্ঠা, বৈরাগ্য নিষ্ঠা অকিঞ্চনা ভক্তিতে নিষ্ঠা, শ্রীগুরুতে নিষ্ঠা, ব্রত নিষ্ঠা এবং সম্প্রদায় নিষ্ঠা অর্থাৎ মহৎ পরম্পরা নিষ্ঠা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট ভাবে অক্ষুন্ন ছিল। তাঁর ভজন-নিষ্ঠা অব্যাহত গতিতে গঙ্গার স্রোতের ন্যায় অপ্রতিহত ছিল এবং বৈরাগ্য ছিল অতি সুদৃঢ় সংকল্পের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, অটল, অচল। সেখানে কোন প্রলোভনের দ্বারা একটুও প্রলোভিত হননি, কোন অজুহাত, কোন দোঁহাই দিয়েই তিনি অর্থ বিষয়-সম্পত্তিকে কখনই স্বীকার করেননি। তাঁর বৈরাগ্যের বেশ বাইরে ছিল যেমন, তেমনই ভিতরে বিষয় বিষের কোন প্রকার স্পর্শ ছিলনা। অন্তরে ছিল হৃদয় ভরা ভক্তি রসামৃতের অমিয়ার ধারা, সুতরাং অন্তরকে বিষয় বিষ কেমন করে স্পর্শ করবে? অন্তরে-বাহিরে যিনি বৈরাগী হতে

পারেন, ভগবানের প্রকৃত ভক্ত তিনিই হতে পারেন। বাকী সব বেশে আর নামে মাত্র বৈরাগী। বিষয় থেকে মুক্ত না হলে ভগবানের ভক্ত হওয়াই যায় না। বাহিরের আড়ম্বর দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ অসম্ভব। বিষয়-মুক্ত পুরুষই প্রভুর ভক্ত 'হতে পারেন।

যথা—"**আগে হয় মুক্ত তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।**
তবে সে হৈতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।।"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের এই সিদ্ধান্ত অমোঘ ও অব্যর্থ।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে জীবের পরাশান্তি লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন পার্ব্বতী দেবী। তখন বৈষ্ণব-জগতের শিরোমণি ভক্তিরসের ভাণ্ডারী শ্রীমহাদেব বলেছিলেন-বৈরাগ্যই হল পরাশান্তি লাভের সর্ব্বোত্তম পন্থা। সুদৃঢ় বৈরাগ্যই মুক্তি ও ভক্তি লাভের নিকটতম ও দিব্য সাধন।

যথা— "**বৈরাগ্যেন পরাং শান্তিং লভন্তে মানবাঃ শুভে।**
মোক্ষস্যোপনিষদ্ দিব্যং বৈরাগ্যমিতি নিশ্চিতম্।।

(মহাভারত—অনুশাসন পর্ব্বে-২৪৫ অঃ)

বিষয়ের মধ্যে অবস্থিতি করে আমরা যেমন সাধনই করি না কেন, উচ্চকোটির ভজন সম্পর্কে যতই আলোচনা করা যাক্ না কেন, প্রভুর নামে বা যে কোন মহৎ কাজের উদ্দেশ্যেও যতই অর্থ সঞ্চয় করা যাক্ না কেন, তা কখনই সাধন-পথকে প্রশস্ত করতে পারে না। ধন এবং শিষ্য-সেবক দ্বারা যে ভক্তি সম্পন্ন করা হয়,

তা কদাপি শুদ্ধাভক্তি নয়। একথা স্বয়ং শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত।

"ধন শিষ্যাদিভির্দ্বারৈ র্যা ভক্তি রূপপদ্যতে।

বিদুরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা।।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/২৫৯)

অর্থাৎ "ধন ও শিষ্য প্রভৃতির দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা কদাপি উত্তমাভক্তির অঙ্গ রূপে পরিগণিত হয় না, কারণ এখানে ভক্তি শৈথিল্যবশতঃ উত্তমতার হানি হয়"।

সুতরাং মঠাদিতে অনুষ্ঠিত ধনাদি দ্বারা উৎপন্ন যে ভক্তি, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীরূপাদি গোস্বামীপাদগণের নির্ণীত উত্তমা ভক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভক্তি, একথা সর্ব্বদা সত্য। সুতরাং অর্থ সঞ্চয় বলুন, বিশাল বিশাল মঠ মন্দিরই নির্ম্মাণ বলুন, এ সবই নিজের ইচ্ছাপূর্ণ করাই হয়ে থাকে, বলা যায় নিঃসন্দেহে গৌড়ীয়-গোস্বামীপাদগণের মার্গ নয়। এটা আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত।

নিজের জীবনের জন্য এমন কি ধর্ম্মের জন্যও অর্থ ভিক্ষা, ধন সংগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যদি কেহ তা করেন, সেটা সাধু-জীবন নয়, সাধন-মার্গ নয়, নিছক নিজের স্বার্থ পুরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা অনেকেই নিজেদের শ্রীরূপানুগা মার্গে ভজন করি বলে খুব প্রচার করি, অথচ শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের আচরণ ও আদর্শ এবং উপদেশকে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে সরিয়ে রেখেছি, একথা বল্‌লে বেশী

বলা হবে না। কারণ, পরিষ্কার সত্য যে, শ্রীরূপ পাদ একটা মঠ ও একটা মন্দিরও নিজে প্রয়াস করে নির্মাণ করেন নি। একটা পাকা ভজন কুটির পর্য্যন্ত তৈরী করেন নি। অধিক কি সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব জীউর স্বয়ং প্রকটিত শ্রীবিগ্রহের জন্যও মন্দির নির্মাণ করার কোন চেষ্টাই করেন নি। ভগবানের জন্যও ভিক্ষা করা, মানুষের কাছে অর্থাদি চাওয়াকে তাঁরা ভক্তি বিরোধী কার্য্য বলে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যথা —

"সেবা পরৈস্ত যথালাভমেব সেবা কার্য্যা
নতু যাঞ্চাদ্যাতিশয়েন কার্পণ্যং কার্য্যমিতি জ্ঞেয়ম্।"

দুর্গম সঙ্গমনী টীকায় - (১/২/১১৪) দার্শনিক আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ জীব গোস্বামী চরণ। অর্থাৎ গোস্বামীপাদ বল্লেন — যাঁরা ভগবদ্বিগ্রহের সেবা করবেন তাঁরা কখনই যাচনাদি দ্বারা নিজের দীনতা প্রকাশ করবেন না। যথা লভ অনুসারেই সেবা করবেন। আর আমরা? অনেক ক্ষেত্রে কৌশলে যাচনাকেই বৃত্তি রূপে অবলম্বন করি। মঠের বিশালতা ও মঠের সংখ্যার আধিক্য প্রকাশ ও প্রচার করে অহঙ্কার প্রকাশ করি। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচরণও করি। যথা—**"নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ"**

(ভাগবত ৭/১৩/৮)

যথা—**"ধর্মার্থমপি নেহেত যাত্রার্থং বাহধনো ধনম্।**
অনীহানীহমানস্য মহাহেরিব বৃত্তিদা।।

(ভাগবত ৭/১৫/১৫)

অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গের সাধক বা সন্ন্যাসী কখনও মঠাদি

নির্ম্মাণ করবেন না। "ধনহীন ব্যক্তি ধর্মের জন্যও অথবা দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ধন ইচ্ছা করবেন না। যে ব্যক্তি ধন চেষ্টাশূন্য, নিশ্চয়ই তার চেষ্টাহীনতা মহাসর্পের ন্যায় জীবিকা প্রদান করে।।" শ্রীমদ্ভাগবতের স্পষ্ট নির্দ্দেশ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বলা হয়েছে,—"সন্তুষ্ট আত্মারাম ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে তাঁর অন্তঃকরণে যে সুখ হয়, কাম লোভে, অর্থ চেষ্টায় দশদিকে ধাবমান ব্যক্তির সে সুখ কোথায়?

এই ভাবে বিচার করলে দেখা যায়,—আজকের দিনে সবচেয়ে বড় অভাব হল—যথার্থ বৈরাগ্যের স্বার্থ ত্যাগের অভাব, ভগবানে বিশ্বাসের অভাব, তাঁর জন্য সর্ব্ব ত্যাগের অভাব, ভগবন্নির্ভতার সাহসের অভাব, দুর্বল হৃদয় বলেই আমরা অর্থের উপর নির্ভর করি, ভীরু কাপুরুষ বলেই আমরা ভগবানের পরিবর্ত্তে মানুষের উপর ভরসা করি, সুতরাং ত্যাগের ক্ষমতা আসবে কোথা থেকে? সত্যকার ত্যাগ, যথার্থ বৈরাগ্য, যেটি ভক্তি জগতে প্রবেশ করার প্রথম দরজা। এক বৈরাগ্যের অভাবে বিষয়-নিষ্ঠা প্রবল হয়ে থাকায় ভজন সম্পর্কিত কোন আলোচনাই আমাদের ভিতরে প্রবেশ করে না। একথা সর্ব্বথা ধ্রুব সত্য এটা তর্কের কথা নয়। আমরা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপনের জোরে বড় বড় ধর্ম সভা যত আড়ম্বরের সাথেই অনুষ্ঠান করি না কেন, নূতন নূতন মঠ মন্দির যত কায়দা করেই করা যাক্ না কেন, সর্ব্বত্যাগ ব্যতীত কিছুতেই কোনমতেই ভক্ত-ভক্তি ও ভগবানের কৃপার ছোঁয়া লাগা একেবারেই অসম্ভব।

প্রভু স্বয়ং আচরণ করে দেখিয়ে গেলেন, এবং জানালেন

"বিনা সবর্বত্যাগং ভবতি ন ভজনং হ্যসুপতেঃ।।

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন,
অনেক দুঃখে সে মিলয়।
দেহ গেহ পরিবার, বিষয় বাসনা আর,
সর্ব্ব আশা যদি ত্যায়গয়।।"

(ভক্তিরত্নাকর)

দেহ গেহ পরিবার বিষয় সম্পর্কিত সর্ব্ব আশা কেমন করে ত্যাগ করতে হয়, পণ্ডিত বাবা তাঁর দিব্য পবিত্র চরিত্রে দেখিয়ে গেলেন। ভগবদ্ভক্তি তত্ত্বটি যে নিবৃত্তি মার্গের উপর, নিবৃত্তি ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এই ভাগবতের সিদ্ধান্তকে যতদিন না আমরা বুঝতে শিখব, যতদিন না জীবনে আচরণে আনব, ততদিন কোন মতেই ভক্তি মার্গে প্রবেশ করা এই রকম অসম্ভবই হয়ে থাকবে। কেবল মাত্র কথাতেই থেকে যাবে, কারণ নিবৃত্তি মার্গই হল ভক্তির পথ, ভক্তি লাভের উপায়। এই সিদ্ধান্তই শ্রীভাগবতে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে।

যথা— **স বৈ নিবৃত্তিধর্মেন বাসুদেবানুকম্পয়া।**
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ।।"

(ভাগবত-৩।৭।১২)

এখানে স্বামী টীকা অনুসারে অর্থ এই যে, নিবৃত্তি ধর্মের দ্বারাই বাসুদেবের অনুকম্পা হয়, আর ভগবানের অনুকম্পার দ্বারা

তাঁর চরণে ভক্তি হয়, তখন ভক্তির ক্রম অনুসারে মায়া-মোহ ধীরে ধীরে অন্তর থেকে তিরোহিত হয়।"

এই কারণেই নিবৃত্তি মার্গকে অমৃতের পথ বলা হয়েছে। নিবৃত্তিকে পরম ধর্ম ও পরম সুখ বলা হয়।

"নিবৃত্তিঃ পরমো ধর্ম্মো নিবৃত্তি পরমং সুখম্।
মনসা বিনিবৃত্তেন ধর্মস্য নিশ্চয়ো মহান্।।

(মহাভারত অনুঃ পর্ব)

অর্থাৎ "নিবৃত্তি পরম ধর্ম, নিবৃত্তি পরম সুখ, মনের দ্বারা সর্ব্ব বিষয় থেকে বিশেষ ভাবে নিবৃত্ত হলে তিনি নিশ্চিত ভাবেই ধর্মের মহান ফল লাভ করতে পারেন।"

শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড় গোস্বামীপাদগণ এবং প্রমুখ বৃন্দাবনবাসী বিরক্ত বৈষ্ণবগণ সেই নিবৃত্তি মার্গেরই আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন যে, নিবৃত্তি মার্গের পারাকাষ্ঠা সীমার উপরেই ব্রজভক্তি ও গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠা সুদৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। অনেক বিদ্বান্‌গণ মনে করেন যে, শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদি থেকে শুরু করে যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ কেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে শেষ আচার্য্য বলা হয়।

পরবর্ত্তী কালে অনেক বহুদর্শী বিদ্বান্ এসেছেন ঠিকই, কিন্তু আচার্য্য-বাক্যকে যেমন শাস্ত্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রূপে স্বীকার করা হয় তেমন ভাবে আর কোন আচার্য্যকে ঐ রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ঠিক সেই প্রকার শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদি ষড়্

গোস্বামীপাদগণ ও বৃন্দাবন বাসী বিরক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দিষ্ট যে বৈরাগ্যের উপর নির্মিত রাগানুগা ভক্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই ধারা শ্রীবৃন্দাবনে বিরক্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে বহুকাল যাবৎ প্রবাহিত ছিল। ঐ বৈরাগ্যময় রাগানুগা ভক্তি-মার্গের শেষ আচার্য্য রূপে শ্রীপণ্ডিত বাবাকেই নির্দ্দেশ করা যায়।

যেহেতু, তাঁর অপ্রকটের পর বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ৭৪ বৎসরের ইতিহাসে বৈষ্ণব জগতে অনেক পট-পরিবর্ত্তন হয়েছে, ভজন সম্পর্কিত আলোচনা তর্ক-বিতর্কে অনেক প্রকার বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আলোচনা বাদ-বিবাদ যাই হোক্, কিন্তু সেই বৈরাগ্য কোথায়? বৈরাগ্য বিনা, সর্ব্বত্যাগ বিনা, নির্মল অনুরাগের ভজন হতে পারে কি?

"বিনা সর্ব্বত্যাগং ভবতি ন ভজনং হ্যসুপতেঃ।"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

তবে বৈরাগ্যের অর্থ হল সর্ব্ব প্রকার বিষয় ভোগের কামনা ত্যাগ। শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের শুরুতেই ভক্তির বৈশিষ্ঠ্যকে সুষ্ঠুরূপে বলার জন্য প্রথমেই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ করেছেন। সেই লক্ষণে গ্রন্থকার প্রথমেই কামনা ত্যাগের কথাই জানিয়েছেন।

যথা—**"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।**

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/১/১১)

অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান জ্ঞান দ্বারা

অনাবৃত, স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম রহিত আনুকূল্যাত্মক শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলা হয়।"

সার কথা হল অন্য অভিলাষ ছেড়ে কৃষ্ণভজন করলে তবে উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি হবে। কিন্তু কামনা থাকলেই ভক্তি সকাম বলে গণ্য হবে, তাতে কামনা হয়তো পূর্ণ হবে ঠিকই, কিন্তু প্রেম ভক্তির রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাবে। তখন অনেক অনেক জন্ম ধরেও ভ্রমণ করতে হতে পারে।

একথা আচার্য্য পাদ সাধন ভক্তি প্রকরণেও বলেছেন যে, ভগবানে ভাব বা রতি লাভের উদ্দেশ্যেই সাধন করতে হবে, তবেই তাকে সাধন-ভক্তি বলা হবে। নয়তো কেবলমাত্র নিজের কামনা পূরণের জন্য যদি বাহিরে তীব্র বৈরাগ্য বা কঠোর নিয়মও পালন করেন, তাহলে আমরা তাকে কিন্তু সাধন ভক্তি বলব না। তখন হবে আপনার স্বার্থসিদ্ধির অনুষ্ঠান মাত্র।

"অতঃ সকাম ভক্তস্যাপি ভক্তের্নটনমাত্রত্বম্, স্বার্থসাধন মাত্র তাৎপর্য্যেন ভক্ত্যনুকরণমাত্রত্বাৎ নটনত্বম্।।

(ভাঃ০৭।৭।৫১-৫২—ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ)

শ্রীরূপ পাদ তাই বলেছেন—

"কৃতিস্যাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাবিধা"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-১/২/২)

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুষ্ঠিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিটি ভাব লাভের জন্য হলে, তবেই সেই অনুষ্ঠানকে সাধন ভক্তি বলা হয়।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সাধন ভক্তি মানে যা বলা হল, সেখানে বর্ত্তমানে আমাদের কোন খবরই নেই। আর তারও পূর্ব্বে

যে শ্রদ্ধা বা শাস্ত্র বাক্য বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও মাদৃশ জীবের কোন অনুসন্ধান নেই। নেই যে তার বড় প্রমাণ হল—ভগবানের পরিবর্ত্তে অর্থ ও অর্থ দাতাদের প্রতি মাদৃশ জীব অনেকেই ঢের বেশী বিশ্বাসী এবং আস্থাশীল। এই সত্যকে মাদৃশ জীবের আচরণই প্রমাণ করছে, অন্য প্রমাণের দরকারই নেই।

এইজন্যই গোড়াতে বলেছিলাম যে, পণ্ডিত বাবার চরিত্রে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। শোনা যায় তাঁর শরীর বেশ কিছু রোগের ঘর ছিল। 'অজীর্ণ' তার মধ্যে একটি প্রধান রোগ ছিল, খুচরো ব্যাধি প্রায়ই কিছু না কিছু লেগে থাকত। পণ্ডিত বাবা কিন্তু কোন রোগকেই আমল দেন নি। সব রোগ ব্যাধিকেই কাঁচকলা দেখিয়ে ভজন করে গেছেন, বৈরাগ্য নিয়ম অটুট ভাবে রক্ষা করেছেন, এখানে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, কারও সাথে আপোষ করেন নি। তাঁর এই অনমনীয় মনোবল আর অজেয় পৌরুষ দেখে দৈব শক্তি অদৃশ্যভাবে তাঁকে সর্ব্বদা রক্ষা করেছেন।

ভগবানের কৃপা যে কুড়িয়ে পাওয়ার জিনিষ নয়, তার জন্য অনলস সাধনের অনিবার্য্য প্রয়োজন আছে, তা তিনি সকল সাধকগণকেই দেখিয়ে দিয়েছেন। আর আমরা আজ ভয়েই আধমরা হয়ে যাই, টাকা কম হয়ে গেলে চলবে কি করে? আজ না হয় চলছে, পরে কি হবে? একথা ভেবেই অস্থির, আর নিশ্চিন্ত মনে ভজন করার ব্যাপারটাতো কথাতেই থাকে। কারণ খুব সোজা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পালক, করুণাসিন্ধু ভগবানকে বাস্তব জীবনে যথার্থ ভাবে বিশ্বাস করিনি। আমাদের ভিতরে শাস্ত্র-বাক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যতটুকু বিশ্বাস করি তা কার্য্যতঃ

পালন করিনি। কারণ, মাদৃশ জীবের হৃদয়ে প্রচুর শঙ্কা জমাট হয়ে আছে।

এইজন্য ভগবান্ হংসরূপে যখন সনকাদি ঋষিগণকে ভগবদ্ভজন সম্পর্কিত জ্ঞান উপদেশ করছিলেন তখন বলেছেন,—

"সংচ্ছিদ্য হার্দ্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণজ্ঞানাসিনা ভজতঃ মাখিল সংশয়াধিম্" (শ্রীভাগবতে-১১।১৩।৩৩)

অর্থাৎ মনের ধর্ম্মই হল সর্ব্ব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াতীত, গুণাতীত অচিন্ত্য তত্ত্ব যে আমি (ভগবান), আমার প্রতি সংশয় ও সন্দেহই হল যাবতীয় মানসিক দুশ্চিন্তা এবং মানসিক দুঃখের কারণ, তাই সাধুগণের উপদেশ রূপী তীক্ষ্ণ জ্ঞান অস্ত্রকে নিজের অনুমান ও অনুভব দ্বারা শানিত করে সমস্ত অন্তর-সংশয়কে সম্পূর্ণরূপে ছেদন করে আমাকে নিশ্চিন্ত মনে ভজনা কর।।"

কিন্তু আমরা ভগবানের বাক্যে বিশ্বাস করে সন্দেহ-সংশয় ত্যাগ করে প্রভুর উপর ভরসা রাখতে পারি নাই বলে প্রভুর কৃপামৃতের পরশ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি। বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক নাট্যকার 'সেক্সপীয়রের' কমেডিতে দেখা যায়,—ইসাবেলাকে লুসিও বলছেন-"দেখ আমাদের সন্দেহগুলি হল বিশ্বাস ঘাতক। এই সন্দেহের জন্যই আমরা ভয়ে চেষ্টা না করে, অনেক ভাল জিনিষ লাভ করতে পারি নি, অথচ সাহস করে চেষ্টা করলে সেগুলি আমরা অবশ্যই লাভ করতে পারতাম।" এই কথাটা এতই সত্য যে, ভেবে দেখলে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রেই

আমাদের ব্যবহার-জীবনে এবং ধর্ম-জীবনেও একমাত্র এই 'সন্দেহই' উন্নতির পথে এগোতে দেয় না। অথচ সাহস করে চেষ্টা করলে অবশ্যই সফল হতে পারতাম্। মহাপুরুষগণই তার উত্তম দৃষ্টান্ত।

সিদ্ধ মহাপুরুষ যাঁরা বিশেষতঃ ভক্তি মার্গে সিদ্ধপুরুষগণ কি প্রকার সাহসের সঙ্গে কপর্দ্দক শুন্য হয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভগবানে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন। তাঁদের বিশুদ্ধ সরল হৃদয়ের সুদৃঢ় ভগবদ্বিশ্বাসই, তাঁদের জীবনকে অমিয় সুধারাশির স্পর্শে পরমানন্দের দিব্য রসে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। এইজন্য তাঁরা সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করেছেন আর নিজের অকিঞ্চন অবস্থাতেই শত-সহস্র মানুষের দুঃখ মোচন করতেও সমর্থ হয়েছিলেন।

কারণ বিশ্বাসই ভক্তির জীবনীশক্তি, বিশ্বাসই ভক্তের প্রাণ শক্তি, আজ এই বিশ্বাসের অভাবেই আমরা বঞ্চিত হয়ে আছি, কাঙ্গালের মত পার্থিব বস্তুর জন্য, একটু ইন্দ্রিয় সুখের জন্য, কতই না প্রত্যাশা অন্তরে বহন করি।

আজ সভ্যতার যুগে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে ভোগ-বিলাসের কি বিপুল আয়োজন, আবার বড় বড় ধর্ম সভারও সমাবেশ মধ্যে মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু সবই যেন অভিনয়ের আসরে যবনিকাপাতের মত পরক্ষণেই শেষ হয়ে যায়। মহাপুরুষগণের অমূল্য উপদেশ-বাক্য আর হৃদয়ে প্রবেশ করতে চায় না। কারণ, যে শাস্ত্র পড়ছি, শুনছি, তাকে প্রচুর পরিমাণে সন্দেহ করি, ধ্রুব সত্য বলে একটুও বিশ্বাস করি নি। ভগবানের কথা শুনি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। শ্রীভাগবতে ধ্রুব, রাজর্ষি ভরত,

পৃথু মহারাজ, প্রহ্লাদজী মহারাজ, বলি মহারাজ, অম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতি ভক্ত চরিত্রে ভগবানের কি বিপুল মহিমা দেখানো হয়েছে, জানানো হয়েছে ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্যের কথা, বলা হয়েছে ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যময়-কারুণ্যগুণের কথা তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মাদৃশ জীব আমরা এই অদ্ভূত মহিমা-ব্যঞ্জক চরিত্র গুলিকে গল্পের উপাখ্যান মনে করে বসে আছি, আর তুচ্ছ বিষয়-সম্পদের লোভে কত না কৌটিল্য পূর্ণ আচরণ করি, তার হিসাব নেই।

এসবেরও একমাত্র কারণ, শাস্ত্র বাক্যকে রীতিমত অবিশ্বাস করি, ভগবানের প্রতি, তাঁর মহিমার প্রতি আমরা যথেষ্ট পরিমানে সন্দেহ পোষণ করি। যথার্থ ভাবে সুদৃঢ় রূপে ভগবানকে যে বিশ্বাস. করিনি, একথা আমাদের মাথা নত করে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কারণ তার প্রমাণ আমরা নিজেরাই দিয়ে থাকি, ধন-সম্পদের জন্য, অর্থ লাভের জন্য, কত না ফন্দি করি, কত না চাতুরী করি, তার শেষ নেই, শুধু কি তাই, প্রভাব- প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য, মঠাদি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজের কর্ত্তৃত্বকে বজায় রাখার জন্য, সামাজিক অধিকার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার জন্য, কত চাতুরীই না করা হয়। এগুলি আমাদের কাছে চাক্ষুষ ভাবে প্রমাণিত হয়ে আছে। কিন্তু কেন আমাদের ফন্দীর আশ্রয় নিতে হয়? কেন আমরা চাতুরী করি? যেখানে বলা হয়েছে — **'কৃষ্ণ যদি মনে করে ব্রহ্মপদ দিতে পারে, হেন কৃষ্ণ ছাড়া কি কারণে?** এই মহাজন-বাক্যে কি জানানো হয়েছে? যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড - বৈকুণ্ঠের কর্ত্তা, আবার যিনি ভক্তের ইচ্ছাপূরণ করার জন্যই

ব্যস্ত, যিনি ভক্তের বাঞ্ছাতীত ফল দান করেন, সেই কৃষ্ণের ভজন করেও ফন্দীর আশ্রয়? বুদ্ধির চাতুরী করার কোন প্রয়োজন আছে কি? শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভূত দানের কথা লিখেছেন—

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বকাম ব্যক্তিদের মনো অভীষ্ট এমনই আশাতিরিক্তভাবে পূর্ণ করেন যে, চিন্তামনি, কামধেনু ও কল্পবৃক্ষাদি যেন নিজেদের ব্যর্থ মনে করে সলজজ চিত্তে দ্বারকাপুরের ভজন করে থাকে।' — **সর্ব্বার্থিনাং বাঢ়মভীষ্ট পূর্ত্ত্যা....।।**

(ভঃ রঃ সিঃ - ২/১/১২৪)

শ্লোকে একথা দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে। আসলে আমরা ভগবানের বাক্যকে এবং আমাদের প্রধান আচার্য্যপাদগণের উপদেশ বাণীকে আন্তরীক ভাবে মানি না, তাঁদের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করে ধর্ম করি, নিজের ইচ্ছা মত পন্থা তৈরী করে পথ চলি। অথচ কোন ফিকির-ধান্ধা-ফন্দীর জায়গাই নয় এই ভক্তি সাধনের জগৎ। তাই আমরা বড় বড় ধর্ম অনুষ্ঠান বিপুল আড়ম্বরের সাথে যতই সুসম্পন্ন করি না কেন, আসলে ভগবানের উপরেই তো ভরসা নেই, আস্থা নেই এবং বিশ্বাসও নেই। তাই পরাশান্তির আলো আমরা পেতে পারি না।

আমরা বলে এসেছি ভাগবতের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবানের কৃপা লাভের জন্য মাত্র দুটো গুণের দরকার। ভগবানের কৃপার পরশে ধন্য তিনিই হবেন, তাঁর স্নেহের, করুণার স্পর্শ তিনিই পাবেন, মাত্র দুটো গুণের দ্বারা।

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরনৈ র্নৃভিঃ। (ভাঃ ৩।১৯।৩৬)

অর্থাৎ প্রথম ঃ— মনের সরলতা, দ্বিতীয় ঃ—ভগবানে অনন্য নির্ভরতা। ব্যাস, এতেই প্রভু কৃপা করবেন। কিন্তু এ দুটি ব্যাপারেই মাদৃশ জীবের প্রচুর আপত্তি আছে, যথেষ্ট পরিমানেই অস্বীকৃতি আছে। যেহেতু ভগবানের প্রতি আমরা অনেকেই সংশয়ান্বিত হয়েই সাধন-ভক্তির অঙ্গ যাজন করছি। অনেক সদাচারও পালন করছি ও বহু প্রকার সাধন-পদ্ধতি, পূজা পদ্ধতিতেও যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। বৈদিক-আচারকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলে মনে করে প্রকৃত ভক্তি থেকেই বঞ্চিত হয়ে আছি।

'বৈদিক-আচার', ও 'ভগবদ্ভক্তি' যে পৃথক বস্তু, এই বিবেক এখনও হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। তাই আচার-নিষ্ঠাকেই ভক্তি মনে করি। কিন্তু আসল বস্তুটি এসবেরও অনেক উপরের কথা, অনেক মহিমান্বিত বিষয়, তা হল অনন্যভাবে ভগবানকেই জীবনের অবলম্বন রূপে অঙ্গীকার করা। একথা স্বয়ং প্রভু বলছেন তাঁর প্রিয় পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদের নিকট,—

"শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০ পরিঃ)

অর্থাৎ নিখিল শাস্ত্রের সার উপদেশ ঐ একটাই কথা,— "ভগবান কৃষ্ণই আমার রক্ষা কর্ত্তা, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব সম্পত্তি, আমার জীবনেরও জীবন, তিনিই আমার সর্ব্বেশ্বর প্রভু।" এই কথাটা জানাতেই বাহিরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামী রূপে এবং শাস্ত্ররূপে আমাদের বারম্বার প্রেরণা দিচ্ছেন, উপদেশ

দিচ্ছেন। কেবল মাত্র প্রভুকেই রক্ষা কর্ত্তা রূপে অঙ্গীকার কর, তাঁকেই অবলম্বন করে জীবন ধারণ কর। এই হল আসল কথা।

এইজন্য আমি বিধি-নিষেধ বা পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে কোন রচনা লিখি নি, কারণ এজন্য অনেক অনুভবী বিদ্বান আচার্য্যপাদগণ বেশ কয়েকটি গ্রন্থে তা বিষেশভাবে কৃপা করে জানিয়েছেন। বাজারে একাধিক বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত গ্রন্থও অনেক আছে। কিন্তু যা ভক্তগণের প্রাণ ভ্রমরা, তা হল 'ভগবানে শরণাগতি'। এই শরণাগতিই সমস্ত বিধির প্রাণ সঞ্চার করে, অনন্য শরণাগতি ব্যতীত সমস্ত সাধনই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। তাই প্রভু সাধন ভক্তির কথা উপদেশ দেওয়ার সময়ে বলেছেন—**'সর্বথা শরণাপত্তি'**। ত্রি-সন্ধ্যা অর্চ্চন পূজনের মত নয়। শরণাগতি সব সময়েই চাই, প্রাণের মতই শরণাগতির ভূমিকা আছে ভক্তির সাধনে। প্রাণ চলে গেলে দেহকে মৃত বলা হয়, তেমনই ভগবানে শরণাগত না হলে বহু প্রকার সাধনকেও মৃত সাধন বলা যায়। শ্রীভগবানকে জীবনের রক্ষা কর্ত্তৃত্বে রক্ষক রূপে অঙ্গীকার করার নামই হল 'শরণাগতি'। কিন্তু সেই জায়গাটায় মাদৃশ জীব অর্থ সম্পত্তি বা অর্থশালী ব্যক্তিগণকেই বসিয়ে রেখেছি। অথচ ভগবানে শরণাগতি যথার্থ না হলে সাধকের ভগবদ্ভক্তত্বই সিদ্ধ হয় না বা স্বীকৃত হয় না।

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ ভক্তি সন্দর্ভের ২৩৬ অনুচ্ছেদে একথাই লিখেছেন—**"তদেবং শরণাপত্তির্বিবৃতা, তাং বিনা ত্বদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ"**

অর্থাৎ এইভাবে শরণাপত্তি বর্ণিত হল, ভগবানে শরণাগতি

বিনা ভগবদ্ভক্তত্ব সিদ্ধ হয় না।" শরণাগতি ব্যতীত ভগবানে বিশ্বাসের প্রমাণ হয় না। শাস্ত্র বাক্য অনুসারে ভগবানে শরণাগতির নামই 'শ্রদ্ধা'। যা আচার্য্য শ্রীরূপ পাদ বলেছেন—"**আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোऽথ ভজনক্রিয়া ততোऽনর্থনিবৃত্তিঃ**" ইত্যাদি ক্রম অনুসারে সাধকের হৃদয়ে রতি ও প্রেমের আবির্ভাব হয়। এটাই হল ভক্তিসাধনের ক্রম। এই হ'ল সিঁড়ি, কিন্তু আমরা সিঁড়ি ধরে ওঠার চেষ্টা করিনি, সিঁড়ির অনুসন্ধান করার কথা মনেই করিনি। কিন্তু কোন মানুষ বড় বাড়ীর উপরের তলায় উঠতে গেলে প্রথমেই সিঁড়ি ঘরের অনুসন্ধান করে ও প্রথম সিঁড়িটা ধরার জন্য প্রথমেই চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা করি কি না উপরের তলায় কি হচ্ছে, সেখানের লোকেরা কি করছে তাঁরা কেমন সুখে আছে, কেবল তাঁদের কথাই হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি করছি, কতটা নীচে আছি, কিভাবে উপরে যাওয়া যাবে, কেমন করে সেই অনন্ত সুখের ভাণ্ডারের কাছে পৌঁছতে পারব, তার কোন সত্যিকারের অনুসন্ধান নেই, আন্তরীক প্রয়াসও নেই। আর তারজন্য রসের কথা কথাতেই থেকে যায়, অনুভব হয় না।

শ্রীরূপ পাদ প্রথমেই আমাদের সিঁড়িটি দেখিয়ে দিলেন এবং বলেও দিলেন— তার নাম 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধা মানেই ভগবানের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানের মহিমা বর্ণনাত্মক শাস্ত্র বাক্যকে সুনিশ্চয় বিশ্বাস। আর বিশ্বাসের প্রমাণ হল—ভগবানে অনন্যশরণাগতি, অনন্য নির্ভরতা।

"ততঃ জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তচ্ছরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি।"

(ভক্তিসন্দর্ভ-১৭৪ অনুঃ)

আচার্য্য শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীভগবানে শরণাগতিকেই শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ বা চিহ্ন বলেছেন। ভগবানে অনন্য নির্ভরতার নাম শরণাগতি। ভগবানের উপর নির্ভরতা, না অর্থ-সম্পত্তির উপর নির্ভরতা। কিসের উপর আমাদের জীবনের নির্ভরতা আছে সেতো আমরা নিজেরাই ভালভাবে জানি, এ নিয়ে তো তর্ক করার প্রয়োজন হয় না। আচার্য্যপাদ কথাটা খুব শক্ত করেই বলেছেন— **"তাং শরণাগতিং বিনা ত্বদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ"** অর্থাৎ ভগবানে অনন্য শরণাগতি ব্যতীত একজন সাধকের ভগবানের ভক্তত্বই সিদ্ধ বা ভক্তস্বীকৃতি হয় না।" সুতরাং মাত্র গোটা কয়েক আচার পালন করাকে ভক্তি বলে না, ভগবানে অনন্য শরণাগতিকেই ভক্তি বলে। ভক্তির উৎকর্ষতার বিচার এর অনেক উপরের কথা।

দেখুন, এখানে বিরক্ত বৈষ্ণব-সমাজে যে ছড়িদার পঙ্গত ঘরের গেটে থাকেন, তিনি পরীক্ষা করে দেখে নেন যে, ডোর-কৌপীন ধারী বৈষ্ণব কিনা, যদি দেখেন তাঁর বৈষ্ণব বেশাদি ঠিক আছে, তখন তাঁকে পঙ্গতের চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু মহাশয় ও জগতে তো হিসাব আলাদা, সেখানে প্রথমেই ভাবশুদ্ধ ঠিক আছে কিনা, ভগবানের জন্য সবর্বত্যাগ করেছে কিনা, ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভর শীল কিনা, অর্থাৎ ভগবানে অনন্য শরণাগত কিনা, এসব দেখে শুনে তবে সেই চিন্ময়, আনন্দময়, অনন্ত রসের পঙ্গত-ঘরে আপনাকে ঢুকতে দেবে। শ্রীরূপপাদ তাঁর ছড়িদারকে বলে দিয়েছেন-

"তৎ পদাম্ভোজ সর্ব্বস্বৈঃভক্তৈরেবানুরস্যতে"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অর্থাৎ প্রথমেই দেখবে দেহ-দৈহিক বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে সত্য সত্যই "শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সর্ব্বস্ব' হয়েছে কিনা। তারপর রসের পঙ্গতের চিঠি দেবে।

তাঁরা কৃপার মূর্ত্তি বলেই রসের পঙ্গত ঘরের যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এমনই কৃপাময় আচার্য্যদেব যে, সবচেয়ে উপরের ঘরের পঙ্গতে বসার জন্য সেখানে ওঠার জন্য সিঁড়ি পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন। সিঁড়িটি আবার এমন ভাবে তৈরী করেছেন যে, একটা কানা, একজন অজ্ঞ অন্ধ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সেই সর্ব্বোচ্চ কক্ষায় চরম রসের পঙ্গতের স্থানে অনায়াসে পৌঁছতে পারেন। শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রকে ধার্মিকের বা সাধকের চক্ষু বলা হয়। উক্ত দুটি শাস্ত্রের মধ্যে যার একটি শাস্ত্রের জ্ঞান থাকে তাকে কানা বলা হয়, আর যার দুটি শাস্ত্রেরই জ্ঞান থাকে না তাকে ধর্ম-জগতে অন্ধ বলা হয়। তার প্রমাণ গোপকুমার' জনশর্ম্মা' অর্থাৎ শাস্ত্র জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও উভয়েই শ্রীগুরু বাক্যে মন্ত্রের মহিমাকে সুদৃঢ় বিশ্বাস দ্বারাই সাধনে মহাসিদ্ধি লাভ করেছেন।

(বৃহদ্ভাগবতামৃত)

সুতরাং সেইখানে যাওয়ার প্রথম সিড়িটা ধরুন, তাহলে বাকী যতগুলি সিড়ি আছে আপনাকে আর খুঁজতেও হবে না ও কারও কাছে জিজ্ঞাসা করতেও হবে না।

সেই প্রথম সিঁড়ির নাম—শ্রদ্ধা'। আর শরণাগতি হল শ্রদ্ধার রূপ রেখা। ভগবানে অনন্য শরণ গ্রহণ করাকেই 'শরণাগতি' বলে। মৎ সম্পাদিত 'শরণাগতি ও শ্রদ্ধা' নামক গ্রন্থে

শ্রীসনাতন পাদ ও শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্তের উপর লিখিত উক্ত গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। তত্তৎ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। তবে শ্রদ্ধার কাছে পৌঁছতে হলে অর্থ-সম্পদের উপর যে বিশ্বাসটা অনাদি কাল থেকে মনের মধ্যে জমাট হয়ে আছে, তার শিকড় সমেত উপড়ে ফেলতে হবে, সেই সঙ্গে ভগবানের প্রতি, তাঁর ভক্তির প্রতি যে সন্দেহ-গাছটি আমাদের জীবনকে ভগবানের মহিমা-সূর্য্য থেকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে নিবিড় অন্ধকার তৈরী করে রেখেছে, সেই সমস্ত যাবতীয় সংশয়-সন্দেহের মোটা বৃক্ষটিকে শাস্ত্র-বাক্য, মহাজন-বাক্য ও নিজের অনুমান ও অনুভব রূপী সুদৃঢ় জ্ঞানের তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে সমূলে ছেদন করুন। তাহলে নিশ্চয়ই সেই চিন্ময়, আনন্দময় অনন্ত রসের অফুরন্ত আস্বাদন অবশ্যই লাভ হবে। তার প্রমাণ হল সিদ্ধ মহাপুরুষগণ, তাঁরাই আমাদের কাছে সর্ব্বোত্তম সাক্ষী ও সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

তারজন্য হংস ভগবানের বাক্যটি মনে রাখতে হবে,—

"সংচ্ছিদ্য হার্দ্দমনুমান সদুক্তি তীক্ষ্ণ।
জ্ঞানাসিনা ভজত মাখিল সংশয়াধিম্।।"

(ভাগবত-১১।১৩।৩৩)

অর্থাৎ ভগবৎ সম্পর্কিত সমস্ত সংশয়কে সমূলে ছেদন করে প্রভুর ভজন কর।

যাই হোক্, আলোচ্য পণ্ডিত বাবার জীবন-চর্য্যা থেকে এই শিক্ষা আমরা পেতে পারি যে, সংসারের যে কোন পরিস্থিতিতেই এবং যে কোন কর্ত্তব্য অপেক্ষা ভগবানের উপাসনা সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। এই তত্ত্ব যতদিন না ঠিক ভাবে বোঝা যায়, ততদিনই অন্য

কাজ ও অন্য কর্ত্তব্যকে বড় বলে মনে হয়, আর ততদিনই এই সংসারে ভ্রমণ করতে হয়।

পণ্ডিত বাবার জীবনীতে আমরা দেখলাম সংসারের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু যৌবনের পূর্ণ পৌরুষ শক্তি দিয়ে আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা প্রচণ্ড ভাবে সংঘর্ষ করেই তিনি সংসার-যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এক শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামীপাদ লিখেছেন— "অজ্ঞান নিবৃত্তির পূর্বে পৌরুষ ত্যাগ করা মুর্খতা মাত্র,........." (ভাঃ ৮/১৯/১৩) অর্থাৎ 'শ্রীভগবানই এই জগতে সর্ব্বময় কর্ত্তা' এই জ্ঞান সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত এবং তাঁরই শ্রীচরণ কমলে নিজেকে সমর্পণ না করা পর্য্যন্ত নিজের পৌরুষ অর্থাৎ বোল আনাই চেষ্টা করতে হয়। তা না করলে নিজের মুর্খতাই প্রকাশ পায়। এটাই শ্রীস্বামীপাদের বক্তব্য। কিন্তু দেখবেন ভীত কাপুরুষ তুল্য ব্যক্তিগণ নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য ভগবদিচ্ছা বলে, মানে ভগবানের দোহাই দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে ভয়ে চুপ করে থাকে । আর নির্জ্জীবের মত কয়েকটি মাত্র ধর্ম্মের আচার নিয়ম পালন করাকেই উচ্চ কোটির উপাসনা মনে করেন। কিন্তু নিজের কাজের সময় সংসারের অর্থ সম্পত্তি সংগ্রহ ও রক্ষার জন্য সেই মানুষটাই সিংহ-বিক্রমে সংঘর্ষ করে থাকে। তখন কিন্তু ভগবদিচ্ছা বলে চুপ করে বসে থাকে না, বিষয়-সম্পদের জন্য ক্ষুধার্থ বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সত্যসত্যই যদি কেহ ধর্মের অনন্ত মহিমাকে পেতে চান,

উপলব্ধি করতে চান, তাহলে তাঁকে সত্য সত্যই বাস্তব জীবনের মাটিতে পা রাখতে হবে। আকাশ কুসুম কল্পনা ছেড়ে বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে পথ চলতে হবে। মহাপুরুষগণ তাই করেছেন। ভগবদ্বিশ্বাস এক অনন্ত শক্তির উৎসকেন্দ্র। আপনি যতই বিশ্বাস করবেন, ততই আপনি পারিপার্শ্বিক জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করবেন, ততই আপনি অসীম ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবেন। এ বিষয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুস্পষ্ট প্রতিজ্ঞা-বাক্য আছে—

যথা,— **"ন কশ্চিন্মৎপরং লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া।**
বিভূতির্ভিবাভিভবেদ্দেবোহহপি কিমু পার্থিবঃ।।

(ভাগবত-১০/৭২/১১)

অর্থাৎ "মৎ পরায়ণ কোন অকিঞ্চন ব্যক্তিকেও কোন দেবতাও তেজঃ যশঃ ও সৌভাগ্য এবং সশস্ত্র সৈন্যাদি বিভূতি প্রভৃতির দ্বারাও কখনও পরাভব করতে সমর্থ হয় না, আর মানুষের দ্বারা যে পরাভূত হয় না এ তো বলাই বাহুল্য।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত পাণ্ডবগণ, ভক্ত প্রহ্লাদ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আপনারা আশ্চর্য্য হবেন— অতি শান্তশিষ্ট বালক প্রহ্লাদ একা একটা ভয়ঙ্কর বিরাট রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করেছেন। কখনও পরাজিত হন নি, পিতা হিরণ্যকশিপু চতুর্দ্দশ ভুবন কাঁপানো সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রহ্লাদের এই নির্ভীকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। অবশেষে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন প্রহ্লাদকে "তুই কার বলে বলীয়ান? প্রহ্লাদ অতি সহজ সরলভাবে পিতাকে বল্লেন—

"ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্ স বৈ বলং বলিনাঞ্চ পরেষাম্"

(ভাগবত—৭।৮।৭)

অর্থাৎ, হে পিতা! সেই সর্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিই আমার একমাত্র বল, একমাত্র শক্তি ও ক্ষমতা। আর একটা কথা জেনে রাখবেন—তিনি কেবল আমারই বল নন, আপনি যে ক্ষমতায় জগৎ কাঁপাচ্ছেন সেই ক্ষমতাও তাঁরই ক্ষমতা, এবং সৃষ্টিতে যত বলশালী শক্তিমান ব্যক্তি আছে তাঁদের সকলের বল, সকলেরই ক্ষমতা সেই প্রভু সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিরই ক্ষমতা, তাঁর শক্তি ছাড়া কারও স্বতন্ত্র শক্তি নেই। একথা শুনে হিরণ্যকশিপু ক্ষেপে আগুণ হয়ে গিয়েছিলেন,—বলেছিলেন- তাহলে দেখা যাক্, মানে চ্যালেঞ্জ দিয়ে 'প্রহ্লাদকে বলছেন—"আমি তোর মস্তক নিজের হাতে ছেদন করছি, দেখি কোন হরি তোকে আজ রক্ষা করে, আমার বল আছে কি না দেখ তাহলে," এই বলেই এক তীক্ষ্ণ খড়গ্ নিয়ে প্রহ্লাদকে যখন সত্য সত্যই হত্যা করতে উদ্যত হলেন, এবং শ্রীহরির ঠিকানাটাও জানতে চাইলেন—তখন প্রহ্লাদের উক্তি অনুসারে স্ফটিক স্তম্ভ থেকেই ভীষণ গর্জ্জন কর্তে কর্তে অনন্ত শক্তিশালী প্রভু শ্রীনৃসিংহদেব প্রকটিত হয়েছিলেন এবং অজেয় মহাশক্তিশালী অসুরকে হত্যা করে ভক্ত প্রহ্লাদের উক্তির সত্যতাকে প্রমাণ করেছিলেন। শ্রীভাগবতে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

আমরা কিন্তু যে ভক্তি করি, যে ধর্ম পালন করি, সেটা স্রেফ একটা নির্জীব আচার মাত্র। আমাদের আসল কাজ হল অর্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। অর্থের জন্যই আমরা ধর্ম করি, ভক্তি করি,

অনেক কায়দা কানুন দেখিয়ে অজ্ঞ জনতাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করি। মূল কথা হল যে, শাস্ত্রীয় বৈদিক-আচার ও ভগবদ্ভক্তি, এ দুটো যে পৃথক ভিন্ন বস্তু; এটাইতো আমাদের কাছে অজ্ঞাত হয়ে আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে বৈদিক-আচার, বর্ণাশ্রম ধর্ম শিক্ষা দিতে আসেন নাই, তিনি জগতের জীবকে শুদ্ধা ভক্তি শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। এইজন্য যেদিন নীলাচলে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ বাসি মুখে, স্নানাদি না করা অবস্থাতেই প্রসাদ ভক্ষণ করেছিলেন। তখন প্রভু আনন্দে আত্মহারা হয়ে সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন যে—

আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।।
আজি নিষকপটে তুমি হইলা কৃষ্ণাশ্রম।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়।।
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন।।
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হইল তোমার মন।
বেদধর্ম লঙিঘ কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ)

এখানে সারকথা হল বেদধর্ম লঙঘন করে প্রসাদভক্ষণ উপলক্ষণে শুদ্ধা ভক্তিতে বিশ্বাস হওয়ার জন্যই প্রভু উল্লাস প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে অনাচার যেমন যে কোন সাধনেরই পরিপন্থী, বৈদিক আচারও কিন্তু ভক্তি নয়, 'ভক্তি' ভিন্ন

বস্তু। প্রভু এখানে সেটাই জগৎকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু যাঁরা সেই সর্ব্বেশ্বর প্রভুকেই নিখিল সিদ্ধির মূল ও যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব কর্ত্তা জেনে তাঁরই শ্রীচরণকমলকে মনে প্রাণে আশ্রয় করেন, অবশ্যই তাঁরা পরমানন্দ রসের অমিয় ধারায় জীবনকে অভিষিঞ্চিত করে ধন্যাতিধন্য হয়ে থাকেন। কখনও তাঁরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ জাগতিক ধনসম্পদ ও জাগতিক বৈভব প্রাচুর্য্যের কোন পরোয়া করেন না। তাঁদের জীবন ভগবানের কৃপামৃতের পরশে এক দিব্য সুখের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। কারণ, তাঁরা অর্থাশ্রয় ও ধর্মাশ্রয়কেও পরিত্যাগ করে সুখসিন্ধু সর্বশক্তিমান ভগবানকেই আশ্রয় করেন।

আসল কথা হল ভগবানের ও ভক্তির মহিমা যেদিন আমরা বুঝতে পারব, যে দিন অনুভব করতে শিখব যে, অর্থ সম্পদ বা সমগ্র লৌকিক ঐশ্বর্য্য সুখের চেয়ে ভগবানের মহিমা অনেক অনেক গুণে বড় তাঁর ভক্তির মহিমার কাছে লৌকিক ধন-সম্পদ, লৌকিক সুখৈশ্বর্য্য কিছুই নয়, এই জ্ঞান, এই বোধ, এই বিবেক যেদিন হৃদয়ে জাগ্রত হবে, সেই দিনই প্রভাত-সূর্য্যের মত উদিত হয়ে আমাদের হৃদয়ে প্রেমভক্তি সূর্য্যের প্রকাশ হবে। এ কেবল কথার কথা নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী চরণ 'বৃহদ্ভাগবতামৃতের এক শ্লোকের টীকায় এই সিদ্ধান্তই লিখেছেন।

যথা-"**ভগবতস্তদ্ ভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যবিশেষজ্ঞানাদেব প্রেমভক্তিঃ সম্পদ্যতে ইতি সর্ব্বত্র উচ্যতে।**"

(বৃহদ্ভাগবতামৃত-১।৭।১৫৯ দিগ্‌দর্শিনী)

অর্থাৎ ভগবান এবং তাঁর ভক্তির বিশেষ মহিমার জ্ঞান

হতেই ভগবানের চরণে প্রেমভক্তি সুসম্পন্ন হয়। এই সিদ্ধান্তই সর্ব্ব শাস্ত্রে নির্ণীত হয়ে আছে।"

সুতরাং যেখানেই দেখা যাবে ভগবানের কৃপা লাভের পরিবর্ত্তে অর্থ লাভের আশাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে আছে, যেখানেই দেখা যাবে ভগবানে ভক্তিলাভের পরিবর্ত্তে অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিষ্য-সেবক সংগ্রহ প্রভৃতি লাভের জন্য রীতিমত প্রয়াস চলছে, এমন কি চাতুরীর আশ্রয় নিতেও পিছপা নয়, তখন অবশ্যই মাথানত করে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, মহাশয় আমরা গোস্বামীপাদগণের উপদিষ্ট ধর্ম্ম মানি না, এটা আমাদের নির্ম্মীত লৌকিক ধর্ম, সুতরাং লৌকিক ধর্ম্মে, লৌকিক ভক্তিতে, লৌকিক শ্রদ্ধায় এ সবই চলে, এখানে প্রভুর কৃপার জন্য ধর্ম্ম নয়, অর্থই হল সার কথা। সুতরাং প্রেমভক্তি লাভের প্রশ্নই এখানে ওঠে না। যাই হোক্ এ হোল জগতের লৌকিক ধর্ম্ম।

বস্তুতঃপক্ষে প্রভু যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছেন তার নাম 'ভাগবত ধর্ম্ম'। যাকে শুদ্ধাভক্তি বলে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে কৃপা করার সময়ে প্রভু যে 'মহাউপদেশ' দিয়েছিলেন, তা যদি কেহ হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন তাঁর জীবন মহাধন্যাতিধন্য হয়ে যাবে এতে অনুমাত্রও সন্দেহ নেই। যথা —

"মন দিয়া বুঝ বিপ্র দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে।।
এতেক মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর সেবা চিত্ত দৃঢ় করি।।

এতেক ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ গিয়া ভজহ সকাল।।
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ হইয়া নিশ্চয়।।
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্ত বৃত্তি হয়।।
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে।।
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১১ অঃ)

এখানে ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অর্থাদি সম্পত্তি, যশঃ প্রতিষ্ঠাকে প্রভু জঞ্জাল বলেছেন। তাহলে বুঝুন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ বাক্য কোথায়? আর আমরা কোথায়? কোথায দাঁড়িয়ে কি ভাবছি? কি করছি? পৃথিবীতে এই রকম স্পষ্টাস্পষ্টি কঠোর সত্য ভাষণ কেহ কোথাও শুনেছেন? বিশুদ্ধ ভগবদুপাসনার সাথে বিষয়ের মধ্যে কোনও প্রকার আপোষ হতে পারে না। বিষয় সম্পদ দম্ভ সৃষ্টি করে, অহঙ্কার তৈরী করে। কিন্তু ভগবানে ভক্তি মহা বৈরাগ্য দান করে, নম্রতা শিক্ষা দেয়, দীনতায় মাথা নীচু করে দেয়। এই হোল স্বয়ং প্রভুর শিক্ষা, প্রভুর মহাউপদেশ বাক্য। আর এটা জগতে প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং যেখানে ভক্তি থাকে দম্ভ, অভিমান, অহঙ্কারের প্রশ্নই থাকে না। কেবল মাত্র দীনতাই হল তার প্রবেশ দ্বার, দীনতাই ভক্তির জননী। ভগবানই হন জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেখানে আচারও বড় নয়, ভগবানই জীবনের একমাত্র সার-সর্ব্বস্ব হয়। এই

জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রভুর নৃত্য সংকীর্ত্তন দর্শনের লোভে যে ব্রহ্মচারী গোপনে লুকিয়ে ছিলেন। যাকে শ্রীবাস পণ্ডিত সরলমনে ভেবে ছিলেন, দুগ্ধাহারী, ফলাহারী, অন্ন পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেন না, শুদ্ধ জীবন, অতএব তার প্রভুর দর্শনে যোগ্যতা আছে।

কিন্তু মহাপ্রভু সেদিন ক্রোধের সাথে বলেছিলেন ফলাহারী, দুগ্ধমাত্র পান করে জীবনধারণ করে, ব্রহ্মচারী বলে আমাকে দেখবে? এখনই ঘর থেকে বার করে দাও। সেদিনও প্রভু ভক্তির তত্ত্ব বোঝাতে অনেক কথাই বলেছিলেন। তার প্রমাণ হিসেবে এখানে দু-একটা বাক্য উল্লেখ করছি।

"মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন শক্তি?
পয়ঃ পান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি?
চণ্ডালাহো মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়।।
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন।।"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩ পঃ)

তাহালে বুঝুন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা থেকে আজ আমরা পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে সরে গিয়ে কয়েকটা নিয়ম শিক্ষা করে তাকে পালন করাকেই উত্তম ধর্ম বলে মনে করি। আর তা নিজে পালন করে কেবলমাত্র দম্ভ প্রকাশ করি। আর এই দম্ভময় ধর্মকে প্রচার করে নিজে প্রভুর কৃপা থেকে বঞ্চিত হই, আর অপরকেও বঞ্চিত করি।

এখানে প্রভু ভগবানের শরণ গ্রহণ করাকে অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অনন্য নির্ভরতাকে 'ভক্তি' বলেছেন। এছাড়া ফলাহার, বা দুগ্ধমাত্র পান কিম্বা ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস প্রভৃতি নিবৃত্তি মার্গের বেশ ধারণকেও প্রভু দম্ভ প্রকাশ বলে স্বয়ং মন্তব্য করেছেন, ও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। ভগবানে অনন্য নিষ্ঠা ব্যতীত শুদ্ধাচারের কোন মূল্যই প্রভু দিলেন না। কারণ, ভক্তিহীন শুদ্ধাচার, প্রাণহীন দেহের মতই ব্যর্থ হয়ে থাকে। শুদ্ধাচার তখনই প্রাণবন্ত হয়, যখন ভগবানকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন করা হয়। জীবনের একমাত্র মূলধন করা হয়। বর্তমানে কেহ কেহ কেবলমাত্র আমিষ আহার বর্জ্জন করাকেই উত্তম ধর্ম বলে অহঙ্কার প্রকাশ করেন। অনেক আবার তাকে উত্তম ভক্ত বলেও মনে করেন। কিন্তু প্রভু এখানে কি শিক্ষা দিলেন? আমিষ বস্তুটা তো শুদ্ধ ধার্মিক মানুষের ভোজ্য বস্তুই নয়। অন্ন, শস্য প্রভৃতি মানুষের ভোজ্য, প্রত্যেক মানুষের এটা সাধারণ আহার্য্য বস্তু।

এখানে মনে রাখতে হবে— ঐ ব্রহ্মচারীর শুদ্ধ আহার, শুদ্ধ জীবন, অন্ন পর্যন্ত ত্যাগ করে দুগ্ধ পান করাকে প্রভু নিন্দা করেন নি এবং অশুদ্ধ আহারী, অনাচারীকে সমর্থন করেন নি। অশুদ্ধ আহার, অনাচার-দুরাচার মাত্রই প্রত্যেক শুদ্ধ ধার্মিক মানুষেরই বর্জনীয়। বিশেষতঃ ভক্তিমার্গে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে অবশ্যই ঐগুলি বর্জন করতে হবে। কারণ,— অসদাচারে চিত্ত মলিন হয়, আর মলিন চিত্তে ভক্তিতে, ভক্তির সাধনে প্রবৃত্তিই হতে পারে না। যথা — "**সদাচারং বিনা পাপেন চিত্তে মলিনে**

সতি ভক্তৌ প্রবৃত্তিরপি ন স্যাদিতি।" বৃহদ্ভাগবতামৃতে দিগ্‌দর্শিনী টীকায় (২/৩/১৭১) গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীপাদের নির্ণীত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

তাহলে এখানে প্রভু যে শিক্ষা দিয়েছেন সেটা ভক্তির শিক্ষা। অর্থাৎ 'ভক্তি' অনাচার ও বৈদিক আচারের অনেক উপরে আছে। কেহ কেহ যে বৈদিক আচারকেই ভক্তি বলে মনে করেন। এটা তাঁদের নিজেদের ভ্রমমাত্র। কল্পিত ভাবনা মাত্র।

কিন্তু যদি কেহ গোস্বামীপাদগণের ধর্ম্ম ও সর্ব্বেশ্বর প্রভুর কৃপা সত্যসত্যই জানতে চান ও পেতে চান, তাহলে তাঁকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ রাগানুগামার্গের দার্শনিক প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবপাদত্রয়ের রচিত যথাক্রমে— শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর পূর্ববিভাগ, উজ্জ্বল নীলমনির স্থায়ীভাব প্রকরণ, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের উভয় খণ্ড, শ্রীভাগবত সন্দর্ভ বিশেষতঃ শ্রীভক্তি সন্দর্ভ ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থরত্নগুলির মর্ম বিচার করতে হবে। কারণ ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের মূল দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব রস সাহিত্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাদর্শ।

তাই সিদ্ধ পুরুষগণের মতই এই অলৌকিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে। বীরের মতই অগ্রসর হতে হবে, সাহসী হয়ে ভগবানের কৃপাশক্তি সঞ্চয় করতে হবে। জীবনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে বিপুল উৎসাহ নিয়ে এই পরম সত্য, মহাসত্য স্বরূপ

ভগবানের সাধনের পথে চলতে হবে, তাহলে নিশ্চয়ই প্রভুর অনন্ত মহিমা সিন্ধুর কণার স্পর্শ পাবেনই পাবেন। এখানে অনুমাত্রও সন্দেহ নেই।

এই কথা নিশ্চিতভাবে সত্য যে, সাধনের পথটা যদি সঠিক হয়, তাহলে গন্তব্যস্থল দূরে নয়। পথ চলার আগে প্রকৃত পথটা ঠিক করুন। গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাবেন না। তাহলে এই জন্মেই হবে, এই দেহের জীবিত কালেই প্রভুর কৃপামৃতের পরশ পাবেন। দেখুন সত্যকার সাধন-ভজন হলে ভোজন করার মতই সঙ্গে সঙ্গেই তার সত্যকার ফল পাবেন। এ কথা ভাগবতে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। ডেকে হেঁকে বলা হয়েছে। ভোজন করার সময়েই যেমন সুখানুভূতি হয়, দেহ পুষ্টি হয়, ক্ষুধার শান্তি হয়। ঠিক সেই রকমই ভগবানের একান্ত শরণাগত ভক্তেরও- দুঃখ নিবৃত্তি, সুখ প্রাপ্তি সাধন করার সময়েই হয়। প্রথমে বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা হয়, তারপর ভক্তিতে গাঢ় নিষ্ঠা হয় এবং পরিশেষে হৃদয়ে ভগবানের অনন্ত সুখ মাধুর্য্যের আস্বাদন হয়। তখন এমন অবস্থা হয় দেহ-দৈহিক স্মৃতি পর্য্যন্ত থাকে না, অনন্ত সুখ সাগরে আত্মা উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হতে থাকে।" "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র", শ্লোকে ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বলা আছে।

কিন্তু শর্ত ঐ একটাই, —সেই সর্ব্বেশ্বর প্রভুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে। অবশ্য একথা অতি সত্য যে, তিনি কৃপা করার জন্য করুণার শ্রীকরকমল আমাদের জন্য সর্ব্বদা প্রসারিত করে রেখেছেন। মানে আমাদের জন্য হাত বাড়িয়ে

রেখেছেন। তারজন্য চাই প্রভুকে বিশ্বাস করা, তাঁকেই ভরসা করা, মনে প্রাণে সর্ব্বভাবে নির্ভর করা।

ভগবান অনন্ত সুখের মহাসমুদ্র। তাঁকে বিনা চেষ্টায়, বিনা যত্নে কি করে পাওয়ার আশা করা যায়। প্রভুর দাম বন্ধন লীলা, আমরা প্রত্যেক বৎসর নিয়ম করে শুনি, সেখানে তিনি কি দেখালেন, তিনি ঐ লীলায় আমাদের কি জানালেন? তার কি কোন বিচার করা হয়? সবাই জানেন- মা যশোদা বন্ধন করতে গিয়ে প্রথমে বন্ধন করতে পারছিলেন না। ছোট থেকে বড় বড় দড়ি যোগ করেও বাঁধা যাচ্ছিল না, বারবার দু-আঙ্গুল পরিমান কম হয়েছিল। কি আশ্চর্য্য কথা দেখুন,—এক আঙ্গুল নয়, তিন আঙ্গুল নয়, সেই দু-আঙ্গুল কম থেকেই যাচ্ছে, বাঁধা আর যাচ্ছে না। লীলাবক্তা দার্শনিক পুরুষ, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি মহা মহা যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন মুনি ঋষিগণ এক মনে শুনছেন এই অদ্ভুত লীলা মাধুর্য্যের বর্ণনা। আর ভাবছেন মায়ের সাহস তো কম নয়, এ যে পরমেশ্বর অনন্ত মহিমায় মণ্ডিত, অচিন্ত্য বিভু তত্ত্ব। এযে বন্ধনের বস্তুই নয়। আচ্ছা দেখা যাক্ কি হয়! তারপর শুকদেব পাদ কি বল্লেন—দু-আঙ্গুলের তত্ত্বটা জানিয়ে দিয়ে বন্ধনের কথাটা শোনালেন,—

স্বমাতু স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।।

(শ্রীভাগবত-১০।৯।১৮)

শুকদেব পাদ বলছেন— হে মহারাজ! নিজ মাতা যশোদা

ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে গেছেন, বন্ধন করার পরিশ্রমে কেশ বন্ধন খুলে গেছে, যাকে বলে ঘাম ঝরানো পরিশ্রম, মায়ের এই পরিশ্রম দেখে তখন সেই সর্ব্বেশ্বর অনন্ত ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অচিন্ত্য বিভু তত্ত্ব হয়েও শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় বশীভূত হয়ে নিজের বন্ধন স্বীকার করেছিলেন।"

এখানে শ্রীজীব পাদ দু-আঙ্গুলের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,—

"স্থিতেহপি প্রেম্নি বৈয়গ্র বিশেষতজ্জাত-তৎকৃপাবিশেষাভ্যাং দ্বাভ্যামনুত্বেন তদ্বশীকরণং ন স্যাৎ। অতএব "দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে" ইতি।"

(লঘুতোষণী টীকা-১০।৯।১৫)

অর্থাৎ যশোদা মায়ের অন্তরে প্রেম তো ছিলই, তবু বাঁধা যাচ্ছিল না কেন? না ভগবানকে বাঁধার জন্য যতখানি ব্যগ্রতার দরকার, যতখানি ব্যাকুল উৎকন্ঠাময় প্রচেষ্টার প্রয়োজন সেটা প্রথম অবস্থায় ছিল না, আর উৎকন্ঠাময় ব্যাকুল চেষ্টা দ্বারা ভগবানের যে কৃপার প্রয়োজন হয়, তা প্রথমে সেই কৃপাও ছিলনা।" ভজন পরিশ্রম, আর ভগবানের কৃপা, এই হল দু-আঙ্গুল।

তাহলে ভগবানের জন্য উৎকন্ঠাময় উৎকট পরিশ্রম, আর সেই পরিশ্রম দেখে তাঁর কৃপার আবির্ভাব, এই হল দু-আঙ্গুলের তত্ত্ব।

অতএব ভগবানের এই লীলা চরিত্র দ্বারা এ কথা নিশ্চিত হল যে, যদি কেহ সেই সুখ সিন্ধু, কৃপা সিন্ধু ভগবানের কৃপা লাভ করে জীবনকে ধন্য করতে চান, সত্য সত্যই তাঁকে পেতে

ইচ্ছা করেন, তাহলে আবার বলতে হয়,—বিষয় কার্য্যের জন্য, মানে ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করা, ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা, জমি-জায়গা ব্যবসা-বানিজ্য, বা লেখাপড়ায় উচ্চস্থান অধিকার করা প্রভৃতির জন্য যতখানি মনোবল, যতখানি দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে লেগে পড়ার প্রয়োজন হয়। ঠিক ততখানি বা তার চেয়েও অধিক দৃঢ়তার সাথে অলৌকিক ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ ভগবানের কৃপা লাভের জন্য অগ্রসর হতে হয়। সব বাধা-বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে বীরের মত পৌরুষ শক্তি নিয়ে এই সাধনার পথে চলতে হয়। সিদ্ধ পুরুষগণ কি ভাবে সমস্ত পৌরুষ শক্তি প্রকাশ করেছেন, কেমন করে তাঁরা অনমনীয় অটুট মনোবল নিয়ে এগিয়ে গেছেন, তাঁরা তা বাস্তব-জীবনে আচরণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। কোন বাধা, কোন বিঘ্নকেই তাঁরা পরোয়া করেন না।

মা যশোদাকেও তাঁর প্রতিবেশীনী বান্ধবীগণ বার বার নিষেধ করেছিলেন, যশোদা একে ছেড়ে দাও, এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে এত দড়ি যোগ করেও যখন বাঁধা গেল না, তাহলে বুঝতে হবে তোমার গোপালের কপালে বন্ধন লেখা নেই। অতএব তুমি বিরত হও, ওকে ছেড়ে দাও। কিন্তু মা যশোদা কারও কথায় কর্ণপাৎ না করে নিজের জেদকে ধরে রেখেছিলেন। মায়ের এই উদ্যম, আর ঘাম ঝরানো পরিশ্রম দেখে প্রভু কৃপা করলেন, বন্ধনটি দুর্ঘট ঘটনা হলেও তা স্বীকার করলেন।

বিষয় কার্য্যের জন্য মানুষ কি পরিশ্রমই না করে, মাতা, পিতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র মরে গেলেও বিষয় কার্য্য

কখনও যেমন বন্ধ হয়ে যায় না, বা কেহ বিষয় কর্ম থেকে বিরত হয় না। ঠিক ঐ প্রকার ভগবানের সাধন-পথে চলতে হলে ঐ রকম অস্খলিত মতি ও দৃঢ়তার একটুও ফাঁক না রেখে, কোন প্রকার দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সিদ্ধ মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগোতে হয়। তাহলে দেখবেন আলো জীবনে আসবেই আসবে।

পরমপূজ্য বৈষ্ণব-জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ ভজন সম্পর্কে অনেক অমূল্য উপদেশ রত্ন দান করে গেছেন। তিনি কোন প্রসঙ্গে বলেছেন,—"জগতে পরমার্থ তো অনেক আছে, কিন্তু সবই তো স্বার্থমিশ্রিত পরমার্থ, বিশুদ্ধ পরমার্থ কৈ? সে হলে অল্পেই কাজ হয়।" দেখুন কথাটা কতখানি অভ্রান্ত সত্য, ধ্রুব সত্য। যেখানে নিজের স্বার্থ থাকে সেই পরমার্থকেই আমরা আদর করি, স্বার্থের জায়গায় আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করি, মুখে বলি পরমার্থ করছি।

যাই হোক্, পণ্ডিত বাবার জীবন-চরিত' থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেলাম জীবনে ত্যাগ চাই, বিশুদ্ধ সরল চিত্তে ভগবানে সুদৃঢ় বিশ্বাস চাই, সর্ব্বত্যাগের সোপানে উঠলে তবে অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়। বৈরাগ্যই হল তার প্রথম পদক্ষেপ। মনে-প্রাণে সাধু হতে হবে, কেবল বেশে সাধু হলে হবে না, ভক্তির জীবনী শক্তি হল ভগবানে অনন্য নির্ভরতা, তাকে কার্য্যে পরিণত করতে হবে, সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করতে হবে। তার জন্য নিয়ম-নিষ্ঠার বেড়াকে খুব শক্ত রাখতে হয়, তবে এই বিঘ্ন-বহুল পথে

এগনো সম্ভব হয়, সাধন-নিয়ম যেন কখনও কোন সময়ে শিথিল না হয়।

শ্রীগুরু পাদপাদ্ম স্মরণ করে জানাই অন্তিম উপসংহারে সর্ব্বেশ্বর প্রভুর শ্রীচরণকমলে অনন্ত প্রণাম। সিদ্ধ পরমপূজ্য শ্রীপাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত বাবার শ্রীচরণ কমলে অসংখ্য প্রণাম, সমস্ত বৈষ্ণব, সর্ব্ব শ্রেণীর ভক্তগণের শ্রীচরণে জানাই আমার সশ্রদ্ধ অসংখ্য প্রণাম।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আমি অতি পামর, মুর্খ অজ্ঞ, ব্যক্তি। বৈষ্ণব আদেশে এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি, যোগ্যতার বিচার করিনি, তবে যতদূর সম্ভব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের উপরেই ভক্তির সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত তত্ত্বের আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও হার্দ্দ এবং ষড় গোস্বামীপাদগণের নির্ণীত যে প্রকৃত রাগানুগা-ভজনাদর্শ, তারই সত্যকার রূপরেখা এবং তথ্য ও তত্ত্বের প্রমাণ সহ কিছু এখানে আলোচনা করা হয়েছে, মাত্র ষড় গোস্বামীপাদগণের মতাদর্শের স্পষ্টীকরণের জন্যই, কিন্তু কোনও আচার্য্য পাদের মতকে খর্ব করার জন্য নয়। কারণ, প্রত্যেক আচার্য্যপাদই পূজ্য ও প্রত্যেক ভক্তই বন্দনীয়।

যিনি যে ভাবেই ভজন করুন ভজনের অনুরূপই ফল পাবেন, তবে মতাদর্শের তারতম্য অবশ্য স্বীকার্য্য। তথাপি এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য এই যে, ষড় গোস্বামীপাদগণই হলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ণীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য।

একথা মনে রেখেই ভজন-পদ্ধতি সম্পর্কে বিবেচনা করা উচিত।

যাঁর যেমন অভিরুচি তিনি তেমন ভাবেই ভজন করবেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালের বা আধুনিক আচার্য্য পাদগণের সাথে ষড় গোস্বামী পাদগণের ভজন ধারার মধ্যে যে আমূল পার্থক্য আছে তা এই গ্রন্থে ১৮-২১ পৃষ্ঠায় লিখিত সিদ্ধান্তের মর্ম বিচার করলেই অতি স্পষ্টভাবে জানতে পারবেন। রাগানুগামার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মানসে সেবা-চিন্তন পদ্ধতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে স্থানে স্থানে জানানো হয়েছে। সর্বশ্রেণীর সাধকগণের বা সকল শ্রেণীর ভক্তি-সাধকগণের জন্য শ্রীচৈতনচরিতামৃত নিরূপিত সিদ্ধান্তই অমোঘ বেদ স্বরূপ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের নিরূপিত সিদ্ধান্তই ষড়গোস্বামী পাদগণের সিদ্ধান্ত। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত এবং সাধ্য-সাধন সম্পর্কেও শেষ কথা। বারম্বার সকল বৈষ্ণবগণের সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে বিনীত প্রার্থনা যে, যদি কোন ভুল-ত্রুটি থাকে অবশ্যই আপনারা ক্ষমা করে সার অংশ গ্রহণ করে এ অধমকে কৃপা করলে কৃত কৃতার্থ মনে করব। আমি নিজে ভজন-সাধন হীন অতি অযোগ্য অক্ষম ক্ষুদ্র জীব, তথাপি যদি কেহ এই মহাপুরুষের চরিত্র রচনায়' বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন, তাহলেও আমি নিজেকে সার্থক মনে করব। ইত্যলম্

!! জয় শ্রীরাধে!!

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram